Vol. I | Issue 1-2

বাংলা বিজ্ঞান কথা

শারদ সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩

Shanti Foundation

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

শান্তি ফাউন্ডেশন: আশা এবং স্বপ্নপূরণের একটি আলোকবর্তিকা
নকুল পারাশর ৬

ঘর বদল
সমীর সর্দার ৮

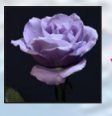

জৈবপ্রযুক্তি: মানব কল্যাণে বহুমুখী প্রয়োগ
সুব্রত কুণ্ডু ৯

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার, জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ
অমিতেশ ব্যানার্জী ১১

স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান, কম খরচে উদ্ভাবন
প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ী ১৩

গণিতেরও রূপ আছে
অনিন্দ্য দে ১৮

ওলবার্সের ধাঁধা
অসিত চক্রবর্তী ২০

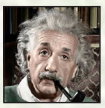

লক্ষ্যভেদী আইনস্টাইন
ভূপতি চক্রবর্তী ২৩

পৃথিবী যেভাবে সবুজ হল
অরুণাভ দত্ত ৩০

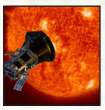

সূর্য নিয়ে শোরগোল
অতনু কুমার দে ৩৪

বাস্তবের নীলকণ্ঠ
দীপাঞ্জন ঘোষ ৩৮

বেঙ্গল বুসলার্ক
তাপস কুমার দত্ত ৪১

চন্ডীতলার ঘাট
আশীষ দাঁ ৪২

ছায়াপথের জ্যোতির্মন্ডল
তন্ময় ধর ৪৪

দেখার তারতম্য
দিগন্ত পাল ৪৫

বেদান্ত দর্শনের পটভূমিতে আয়ুর্বেদ
সুজয় পাল ৪৬

বাস্তুতন্ত্রের বিস্ময়
তুহিন সাজ্জাদ সেখ ৪৮

জলের প্রয়োজনীয়তা, দূষণ, ব্যবহার ও অপচয় সম্পর্কে গণসচেতনতা জরুরি
নন্দগোপাল পাত্র ৫১

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জন্ম যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ৫২

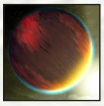

অক্টোবরের আবিষ্কার ৫৫

গ্রন্থ সমালোচনা ৫৬

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার উদ্যম: বিভিন্নতার মেলবন্ধন

ভারতের ভাষাবৈচিত্রের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল ভাষা বাংলা যা প্রায় 23 কোটি লোকের প্রাণের ভাষা। কিন্তু বাংলা সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার কাজ ঠিক সেইভাবে এগোয় নি, যদিও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ফলে, শুধু যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার ব্যাহত হয়েছে তা নয়, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাও জেগে ওঠে নি। সুতরাং সমস্ত ভারতীয় ভাষায়, বিশেষত বাংলাভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার ধারাকে নতুন উদ্যমে জাগিয়ে তোলা আমাদের আশু কর্তব্য।

ভারত ইতিমধ্যেই বহু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাইলফলক স্থাপন করেছে, সে মহাকাশ গবেষণা হোক বা চিকিৎসা বিজ্ঞান। সমস্যা হল, এইসব সাফল্যের খবরগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে, যা মূলত সীমাবদ্ধ থাকে সমাজের একটা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এবং দেশের আপামর জনসাধারণ এই সাফল্যের অংশীদার হয়ে উঠতে পারে না। একটা ভুল ধারণা আমাদের অনেকেরই মাথায় চেপে আছে যে ইংরেজি ভাষা ছাড়া বিজ্ঞান চর্চা অসম্ভব। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ভাষা নির্বিশেষে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি অধিকার সকলের। ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার ফলে সর্বসাধারণের জ্ঞানলাভের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত, বিজ্ঞানচর্চার জন্যও এটি একটি আদর্শ মাধ্যম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বোসের মতো জ্যোতিষ্কের বিজ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ এই ভাষাকেও কখনো কখনো বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজির আধিপত্যকে মেনে নিতে হয়েছে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা শিক্ষাক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানের জটিল ধারণাগুলো এমন একটা ভাষায় পড়তে হয় যে ভাষায় তাদের যথেষ্ট দক্ষতা নেই। ফলে, তারা বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চশিক্ষার উৎসাহ হারায়। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা সম্ভবত এই সমস্যাকে অনেকটাই সরল করে তুলতে পারবে, আমরাও পেয়ে যাবো ভবিষ্যতের এক ঝাঁক তরুণ বৈজ্ঞানিককে। দেশের মোট জনসমষ্টির যে উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছেন, তাদের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, কৃষি, প্রভৃতি সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাও সহজ হয়ে উঠবে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে। আজকের ডিজিটাল যুগে ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। দেশের প্রত্যন্ত অংশেও পৌঁছে গেছে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট। সুতরাং বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সঞ্চারকদের পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাদান-সংক্রান্ত অ্যাপ ব্যবহার করে বাংলায় বিষয় প্রস্তুত করে ইউটিউব, পডকাস্ট বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিজ্ঞান সঞ্চারণা সহজেই করা সম্ভব।

ভারতীয় ভাষায়, বিশেষত বাংলায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার উদ্যোগ আরো বেশি করে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত হতে সহায়তা করবে। স্থানীয় ভাষায় বিজ্ঞান উৎসব, কর্মশালা ও বিজ্ঞান সাংবাদিকতা তরুণ মনে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার আন্তরিক প্রচেষ্টা উৎসাহী বিজ্ঞানীদের জন্য নতুন প্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে।এই কাজকে বাস্তবায়িত করতে দরকার বিপুল উদ্যোগ। এর জন্য জরুরি বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সরকারি দপ্তর ও মিডিয়া সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর অনুবাদ ও নতুন বিষয়বস্তু তৈরী করার জন্য আর্থিক যোগানের প্রাথমিকতাও বিশেষ জরুরি।

পরিশেষে বলতে হয় ভারতীয় ভাষায়, বিশেষ করে বাংলায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার গুরুত্ব উপলব্ধি করা অপরিহার্য। দেশের ভাষা বৈচিত্রের মধ্যে একমাত্র স্থানীয় ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার উদ্যোগই পারে বিজ্ঞানকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে। ভবিষ্যতের বাধাগুলিকে কাটিয়ে উঠে ব্যক্তি ও সামাজিক স্তরে সার্বিক উন্নয়ন, জাতীয় স্তরে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ও বিজ্ঞানের দিগন্তের ব্যাপ্তির এটাই একমাত্র পথ।

বিজ্ঞান কথার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার। নতুন উদ্যমে এই শারদ সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় ও শান্তি ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে। আপনাদের মিলিত সহযোগিতায় আমরা এই পত্রিকাটিকে বাংলার অন্যতম মুখ্য বিজ্ঞান পত্রিকার স্তরে পৌঁছে দিতে চাই। অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান লেখকদের থেকে খুব বেশি লেখা পাওয়া যায় না। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় ও শান্তি ফাউন্ডেশন উৎসাহী বিজ্ঞান লেখকদের নিয়ে প্রতি তিন মাসে একটি করে দুই দিনের কর্মশালার পরিকল্পনা করছে যেখানে প্রশিক্ষণ ও পারস্পরিক চিন্তা ভাবনার আদানপ্রদানের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারবো এক পরিণত বিজ্ঞান লেখক গোষ্ঠী। আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকুন।

বিজ্ঞান কথার সকল পাঠককে জানাই আন্তরিক শারদীয়া শুভেচ্ছা।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা বিজ্ঞান কথা শারদ সংখ্যা
Sep-Oct 2023 | Vol. I | Issue 1-2

উপদেষ্টামণ্ডলী
স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
প্রোঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী
ডঃ ভূপাতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
এবং
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

Shanti Foundation

বিজ্ঞান সংবাদ

নোবেল 2023

তথ্য ও চিত্র www.nobelprize.org থেকে গৃহীত।

বাঙালির উৎসবের মাস অক্টোবর বিজ্ঞান দুনিয়ারও উৎসবের মাস। অক্টোবর মাসেই ঘোষণা করা হয় সেই বছরের নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের নাম। বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদানের শ্রেষ্ঠতম স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়। যথারীতি এবছরও যথাসময়ে ঘোষিত হয়েছে এই সব বিষয়গুলিতে পুরস্কারপ্রাপকদের নাম।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি আলফ্রেড নোবেল-এর সঞ্চিত অর্থ থেকে তার উইল অনুযায়ী এই পুরস্কার দেওয়া হয় এবং এই পুরস্কার দেওয়া হয় মানব সভ্যতার সর্বোচ্চ কল্যাণকারী উদ্যোগের জন্য। আজ পর্যন্ত ছ'টি বিষয়ে মোট 621টি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং মোট পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা 1000। এই তালিকার মধ্যে ব্যক্তি ছাড়া 27টি সংস্থাও আছে। নোবেল পুরস্কার সুইডেনের স্টকহোমে নোবেল ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত হয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে পুরস্কার প্রাপকদের নাম নির্বাচনের দায়িত্ব রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই কাজটি করে স্টকহোমের করোলিনস্কা ইনস্টিটিউট। নোবেল পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 8,31,75,576 যা প্রতিটি বিষয়ে সর্বাধিক তিনজন জীবিত প্রাপককে দেওয়া হয়। এছাড়াও দেওয়া হয় সোনার মেডেল ও একটি প্রশস্তিপত্র। এই প্রশস্তিপত্রটি প্রত্যেক পুরস্কার প্রাপকের জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং এটি কলাশিল্পের নিদর্শন হিসাবে দেখা যেতে পারে। কোনো শাখায় একাধিক ব্যক্তি পুরস্কৃত হলে পুরস্কারের অর্থমূল্য প্রাপকদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। 1901 সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় এবং 2023 সাল পর্যন্ত পদার্থবিদ্যায় 117 টি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং মোট পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা 225। রসায়নে 115 টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 194 জনকে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে 114 টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 227 জনকে। বিজ্ঞানের এই তিনটি বিষয় ছাড়াও সাহিত্য ও বিশ্বশান্তির জন্যও এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সাহিত্যে ও বিশ্বশান্তির জন্য প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের মোট সংখ্যা যথাক্রমে 116 ও 104 এবং পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা যথাক্রমে 120 ও 141।

যদিও নোবেল পুরস্কারের শুরুর সময় অর্থনীতি পুরস্কার দেওয়ার তালিকায় ছিল না, কিন্তু 1968 সালে অর্থনীতি বিজ্ঞানকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ে যে পুরস্কার দেওয়া হয় তার নাম স্ভেরিগেস রিকসব্যাংক পুরস্কার বা নোবেল স্মৃতি পুরস্কার এবং তার জন্য প্রাপ্ত অর্থ নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য। আজ পর্যন্ত অর্থনীতি বিজ্ঞানে 55 বার এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং মোট পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা 93।

পদার্থবিদ্যা

2023 সালে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন **পিয়েরে অ্যাগোস্টিনি, ফেরেঙ্ক ক্রাউস** এবং **অ্যানি ল'হুইলিয়ার**। "আলোর অ্যাটোসেকেন্ড স্পন্দন তৈরি করে ইলেক্ট্রনের গতিবিধি অধ্যয়নের জন্য পরীক্ষামূলক পদ্ধতি" আবিষ্কারের জন্য এই বিজ্ঞানীত্রয়ীকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পিয়েরে অ্যাগোস্টিনির জন্ম 1941 সালের 23 জুলাই। তিনি একজন ফরাসি পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ এবং ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির এমেরিটাস অধ্যাপক, যিনি লেজার পদার্থবিদ্যা এবং অ্যাটোসেকেন্ড বিজ্ঞানে তার অগ্রণী কাজের জন্য বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ পরিচিত। ফেরেঙ্ক ক্রাউসজ 1962 সালের 17 মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন হাঙ্গেরিয়ান-অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ এবং তার কাজের বিষয় অ্যাটোসেকেন্ড বিজ্ঞান। তিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের কোয়ান্টাম অপটিক্স বিভাগের পরিচালক এবং জার্মানির মিউনিখের লুডভিগ ম্যাক্সিমিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। অ্যানি ল'হুইলিয়ার 1958 সালের 16 আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং একজন ফরাসি-সুইডিশ পদার্থবিদ। তিনি সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পার-মাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তার কাজের ক্ষেত্র হল অ্যাটোসেকেন্ড পদার্থবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবিক সময়ে ইলেকট্রনের গতিবিধি অধ্যয়ন করা।

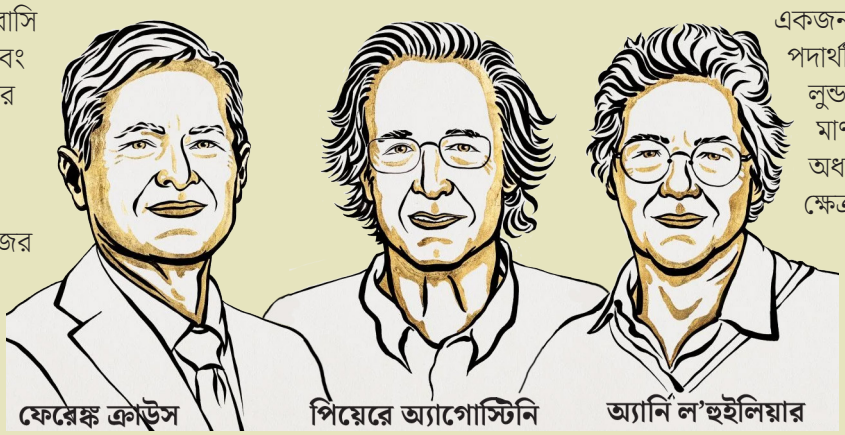

রসায়ন

এবছর রসায়নে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার **মউঙ্গি জি. বাওয়েন্ডি, লুই ই. ব্রুস** এবং **আলেক্সি আই. একিমভ**কে "কোয়ান্টাম বিন্দু আবিষ্কার এবং সংশ্লেষণের জন্য" দেওয়া হয়। মুঙ্গি গ্যাব্রিয়েল বাওয়েন্দি 1961 সালের 15 মার্চ জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন আমেরিকান-তিউনিসিয়ান-ফরাসি রসায়নবিদ। তিনি বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির 'লেস্টার উলফ' অধ্যাপক। বাওয়েন্ডির কাজের ক্ষেত্র রাসায়নিক উৎপাদনে উচ্চ-মানের কোয়ান্টাম বিন্দুর প্রয়োগ।

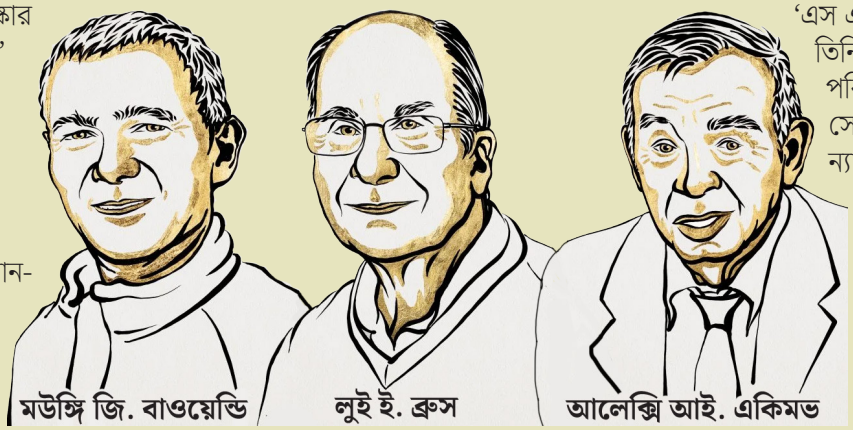

লুই ইউজিন ব্রাস 1943 সালে 10 আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্তমানে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের 'এস এল মিচেল' অধ্যাপক। তিনি কোয়ান্টাম ডট নামে পরিচিত কলয়েডাল সেমিকন্ডাক্টর ন্যানোক্রিস্টালের সহ-আবিষ্কারক। আলেক্সি ইভানোভিচ একিমভ 1945 সালে 28 ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন রাশিয়ান সলিড-স্টেট পদার্থবিদ যিনি ভ্যাভিলভ স্টেট অপটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করার সময় কোয়ান্টাম ডট নামে পরিচিত সেমিকন্ডাক্টর ন্যানোক্রিস্টাল আবিষ্কার করেছিলেন।

শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা

2023 সালের শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারটি যৌথভাবে পেয়েছেন **ক্যাটালিন কারিকো** এবং **ড্রু ওয়েইসম্যান**। "কোভিড-19 এর বিরুদ্ধে কার্যকর mRNA ভ্যাকসিনের বিকাশকে সক্ষম করে এমন বেস পরিবর্তনের বিষয়ে তাদের আবিষ্কারের জন্য" এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্যাটালিন 'ক্যাটি' কারিকো 1955 সালে 17 জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি একজন হাঙ্গেরিয়ান-আমেরিকান বায়োকেমিস্ট যিনি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)-

মধ্যস্থ প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রোটিন প্রতিস্থাপন থেরাপির জন্য ভিট্রো-ট্রান্সক্রাইবড মেসেঞ্জার RNA (mRNA) বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ড্রু ওয়েইসম্যান 1959 সালে 7 সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং একজন আমেরিকান চিকিৎসক এবং ইমিউনোলজিস্ট যিনি আরএনএ জীববিজ্ঞানে তার অবদানের জন্য পরিচিত। ওয়েইসম্যান হলেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পেরেলম্যান স্কুল অফ মেডিসিনের অধ্যাপক।

অর্থনীতি বিজ্ঞান

অর্থনীতি বিজ্ঞানে এবছর স্ভেরিগেস রিকসব্যাংক পুরস্কার বা নোবেল স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন **ক্লডিয়া গোল্ডিন**। "নারী শ্রমশক্তির প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বের ভাবনাস্তরের উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণার জন্য" তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হল। ক্লডিয়া ডেল গোল্ডিনের জন্ম 1946 সালের 14 মে। তিনি একজন আমেরিকান অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ও শ্রম অর্থনীতিবিদ এবং বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির 'হেনরি লি' অধ্যাপক। তিনি এনবিইআর-এর জেন্ডার

ইন ইকোনমি স্টাডি গ্রুপের অন্যতম সহ-পরিচালক এবং 1989 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত এনবিইআর-এর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য আমেরিকান ইকোনমি প্রোগ্রামের পরিচালক ছিলেন। গোল্ডিনের গবেষণা নারী শ্রমশক্তি, লিঙ্গভিত্তিক আয়ের ব্যবধান, আয়বৈষম্য, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, শিক্ষা, অভিবাসন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত। অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানের সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বর্তমান সমস্যাগুলির উৎস অনুসন্ধান করাই তার গবেষণার মূল ধারা। ●

শান্তি ফাউন্ডেশন

আশা এবং স্বপ্নপূরণের একটি আলোকবর্তিকা

নকুল পারাশর

এই বিশ্ব নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ, শান্তি ফাউন্ডেশন বিশ্বব্যাপী অগণিত ব্যক্তির জীবনকে স্পর্শ করে, আশার আলোকিত দিশা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই অনুপ্রেরণামূলক অলাভজনক সংস্থাটি নিরাময়, শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের প্রচারের লক্ষ্যে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিস্তৃত প্রবন্ধে, আমরা শান্তি ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কাজ এবং উদ্যোগগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

সমবেদনাপূর্ণ অন্তর আর নিষ্ঠার মেলবন্ধন

শান্তি ফাউন্ডেশনের কর্মধারা গভীরভাবে সমবেদনার শিকড়ের মধ্যে প্রোথিত। এর অটল লক্ষ্য হল প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করা ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ও তাদের পাশে থাকা। যাদের রয়েছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সংগঠনটি সামগ্রিকভাবে এগিয়ে এসে শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের পথে তাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ। একদল নিবেদিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, শান্তি ফাউন্ডেশন পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য কিছু সুরাহা, ভোটাধিকার হারানো বা রাষ্ট্রহীন মানুষদের জন্য এক ব্যাপক ক্ষমতায়নের একটি মঞ্চ হিসেবে উঠে এসেছে। এই মিশনটিকে তাদের পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারা হিসেবে গ্রহণ করে শান্তি ফাউন্ডেশন এমন একটি জগৎ তৈরি করার জন্য যাত্রা শুরু করেছে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি একটি সুস্থ, মর্যাদাপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন।

ছুঁতে হবে সকলকে আর কাজ হবে দলবেঁধে

যদিও শান্তি ফাউন্ডেশনের শিকড় স্থানীয় হতে পারে, তবে এর প্রভাব সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী অংশীদার, স্বেচ্ছাসেবক এবং সমমনস্ক গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করে। শান্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগগুলি ভৌগলিক সীমানা অতিক্রম করে, এমন অঞ্চলে পৌঁছে যায়, যেখানে সহায়তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন৷ তাদের কাজ কোন সীমানা জানে না, এবং এটির লক্ষ্য বিশ্বকে সবার জন্য একটি সুন্দর স্থান করে তোলা। শান্তি ফাউন্ডেশনের সাফল্যের মূলে নিহিত রয়েছে সমস্ত আগ্রহী অংশীদারদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে কাজ। সংগঠনটি সক্রিয়ভাবে অন্যান্য অলাভজনক সংস্থা, সরকারী বিভাগ এবং জনহিতকর ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করে। মানব-সম্পদ, দক্ষতা এবং সম্মিলিত আগ্রহকে একত্রিত করার মাধ্যমে, শান্তি ফাউন্ডেশন তার প্রভাবকে সর্বাধিক করে ইতিবাচক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। এমন একটি বিশ্বে যেখানে মানুষের আশা-আখাঙ্খার বিকাশ এবং তাদের সমস্যার নিরাময়ের গভীর প্রয়োজন রয়েছে, শান্তি ফাউন্ডেশন সেখানে সতত একটি অমূল্য শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। নিরাময়, শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের অটল প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূলতার সম্মুখীন মানুষের জীবনে এই অলাভজনক সংস্থাটি এক আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী শান্তি দেবী: একজন দিকদর্শী নারী

পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার দোরাঙ্গালা তহসিলের বাসিন্দা, শ্রীমতি শান্তি দেবী (1924–1988) ছিলেন সরল কিন্তু স্পষ্টবাদী এবং গভীরভাবে ধার্মিক এক নারী, আর এগুলি সবই ছিল তার বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত। একজন নিবেদিতপ্রাণ গৃহবধূ হিসাবে, তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে তার স্থানীয় পরিবেশের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি শিক্ষার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একজন প্রথম সারির প্রবক্তা হিসেবে উঠে আসেন। অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখে, তিনি তার সীমিত সংস্থান দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে তার লক্ষ্যগুলি পূরণের চেষ্টা করেছিলেন। শান্তি দেবী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী এগিয়ে চলার জন্য যে কাজ তার শুরু হওয়া উচিত পরিবারের মধ্যে থেকেই। সেই হিসেবে, তিনি তার নিজের পরিবার এবং আশেপাশের মধ্যেই তার কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। সামাজিক কল্যাণের জন্য তার বিশেষ আগ্রহ তার সন্তানদের জন্য একটি পথনির্দেশিকা হয়ে ওঠে, যারা তার ভেতরকার চেতনা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল।

তার কাজের প্রভাব এবং রূপান্তরের পরম্পরা

শ্রীমতী শান্তি দেবীর অটল মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত, শান্তি ফাউন্ডেশন আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটি ভারতের চ্যারিটেবল ট্রাস্ট অ্যাক্ট 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত৷ ‘উদ্ভাবনার মধ্যে দিয়ে মানুষের কল্যাণ’—এই ধারণার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার কারণে সময়কে অতিক্রম করে এমন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে উৎসাহিত করেছে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়৷

শান্তি ফাউন্ডেশন টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক জনহিতকর কাজে বিশ্বাস করে, গভীর আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে উচ্চ-প্রভাবসম্পন্ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল বিভিন্ন ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর ও টেকসই মডেল তৈরি করা। একই সাথে, তারা কর্পোরেট সেক্টরে CSR (বা কর্পোরেটের সামাজিক দায়িত্ব) উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এনজিও বা অ-সরকারি সংস্থা, কিংবা অর্থনৈতিক অনুদান প্রদানকারি সংস্থা এবং সমমানসিকতা বিশিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাথে সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তাদের প্রভাবের ক্ষেত্র প্রসারিত করে চলেছে। সংস্থার যাত্রাপথের দিশা শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি এবং সমাজসেবকদের একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা

নির্ধারিত হয়, যারা সংস্থার কাজের প্রভাবকে প্রসারিত করার জন্য একটি সাধারণ মিশন বা লক্ষ্যের জন্য কাজ করছেন।

2019–2022: দৃঢ় পদক্ষেপের একটি সময়কাল

COVID-19 মহামারী দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, শান্তি ফাউন্ডেশন প্রভূত সক্রিয় হয়ে ওঠে। সংগঠনটি মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য যেমন খাদ্য বিতরণ এবং সারা ভারতে অক্সিজেন সরবরাহ করার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। মহামারী দ্বারা সৃষ্ট মানুষের দুর্ভোগ দূর করার জন্য তাদের প্রয়াস তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রকৃত সারমর্ম তুলে ধরেছে।

রূপান্তরের প্রতি নিবদ্ধ অঙ্গীকার

ফাউন্ডেশনের কৌশলগত ফোকাস সমাজের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের উপর:

নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ছাত্র: শান্তি ফাউন্ডেশন গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য **শান্তি দেবী বৃত্তি** দ্রুত চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগটির মধ্যে দিয়ে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে সেই প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলার যা প্রায়শই সুবিধাবঞ্চিত তরুণ-তরুণীদের জন্য শিক্ষালাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নারীর ক্ষমতায়ন: প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার নারীরা প্রায়ই অসংখ্য চ্যালেঞ্জ ও বাধার সম্মুখীন হয়। শান্তি ফাউন্ডেশন তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, উদ্যোগ্রাহীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির মাধ্যমে এই মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত। এই কাজের মূল উদ্দেশ্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা।

বিশেষভাবে-সক্ষমদের ক্ষমতায়ন (মূক ও বধির গোষ্ঠী): শান্তি ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে-সক্ষম, বিশেষ করে মূক ও বধির গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের সামনে থাকা অনন্য চ্যালেঞ্জগুলি অনুভব করে। এই বিশেষ গোষ্ঠীকে সমর্থন করার জন্য, তারা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রতিকারমূলক শিক্ষা এবং জীবিকার জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে। সংগঠনের লক্ষ্য হল এই মানুষদের পরিপূর্ণ এবং স্বনির্ভর জীবন যাপনের জন্য তাদের যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।

একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠনের লক্ষ্যে

শান্তি ফাউন্ডেশনে, তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে নিছক একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিছক ধারণাকে অতিক্রম করে একধাপ এগিয়ে উদারতা এবং রূপান্তরের স্থায়ী উত্তরাধিকারকে মূর্ত করছে। শান্তি দেবী স্কলারশিপ এবং আরও অনেক সমতুল উদ্যোগের মাধ্যমে, তারা শিক্ষাকে সহজলভ্য করছে, নারীর ক্ষমতায়ন করছে এবং যাদের প্রয়োজন রয়েছে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রায়শই প্রতিকূলতার দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত বিশ্বে, শান্তি ফাউন্ডেশন আশা ও নিরাময়ের উৎস হিসেবে কাজ করে; সমবেদনা এবং সম্মিলিত কাজের দ্বারা তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এমন একটি বিশ্ব তৈরি করার লক্ষ্যে যেখানে প্রত্যেকে একটি সুস্থ, মর্যাদাপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে, শান্তি ফাউন্ডেশন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। আর তার সঙ্গে সবার জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ফাউন্ডেশানের চিন্তায় সর্বদা রয়েছে।

শান্তি ফাউন্ডেশন ও রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজের এক কর্মসূচীভিত্তিক মিলিত প্রয়াস

শান্তি ফাউন্ডেশন সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র, মহিলা এবং বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন সম্প্রদায়ের সেবা করার লক্ষ্যে তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজের সাথে এক বিশেষ অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়েছে। এই সহযোগিতা শান্তি ফাউন্ডেশান তাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে৷ 2023 সালের আগস্টে শান্তি ফাউন্ডেশন এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং তারপর থেকে দ্রুত গতিতে কাজ শুরু হয়েছে। এই কর্মভিত্তিক বিশেষ অংশীদারিত্ব শান্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করবে এবং তাদের কাজের প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এই সহযোগিতা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিশেষ কিছু শিক্ষামূলক কর্মসূচি এবং বৃত্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য নতুন দরজা খুলে দেয়। এটি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার বিস্তারকে আরও এগিয়ে নিতে অতিরিক্ত সম্পদ এবং দক্ষতা প্রদান করে। উপরন্তু, এটি মূক ও বধির সম্প্রদায়কে অত্যাবশ্যক সহায়তা প্রদানে শান্তি ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করে, তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরও বেশি সুযোগ এনে দিয়ে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজের সাথে শান্তি ফাউন্ডেশনের এই অংশীদারিত্ব আরও ন্যায়সঙ্গত এবং সমবন্টনের বিশ্ব তৈরি করতে সমমনস্ক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতির একটি উদাহরণ। ●

লেখক ***ডঃ নকুল পারাশর*** *শান্তি ফাউন্ডেশনের মূল কর্মাধ্যক্ষ্য। ইমেল: nakul.parashar@gmail.com*

ঘর বদল

সমীর সর্দার

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এই বিশাল পৃথিবীর ব্যাপক জীববৈচিত্র্যের সমারোহ অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে অবলুপ্তির মাধ্যমে। প্রতিটি প্রাণীই তার নিজ নিজ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরিবর্তিত বাসস্থানে প্রতিনিয়তই অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে টিকে রয়েছে। এদের মধ্যে ব্যতিক্রমী এক বিস্ময়কর প্রাণীর নাম হারমিট ক্র্যাব বা সন্ন্যাসী কাঁকড়া। সন্ধিপদ পর্বের প্যাগিউরয়েডিয়া অধি-গোত্রের অন্তর্গত এই বিশেষ কাঁকড়াটির দেহ লম্বাটে ও তলপেটের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে চিংড়ির মতো আকৃতি ধারণ করেছে। অন্যান্য কাঁকড়ার মত এই প্রাণীটির দেহ কাইটিন নির্মিত শক্ত খোলক দ্বারা আবৃত নয়। তাই এদের দেহ খুবই নরম হওয়ায় সমুদ্রে ও বালুচরে পলি ও নুড়ির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই কাঁকড়া যখন সমুদ্রের জোয়ার আসে তখন ঢেউয়ের আঘাতে অনেক দূরে ভেসে গিয়ে দলছুট ও হতে পারে। এছাড়াও পরিবেশের বিভিন্ন শিকারি প্রাণী যেমন শেয়াল ও অন্যান্য পাখিরা এই সন্ন্যাসী কাঁকড়াদের ভক্ষণ করে থাকে। এই কারণে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য হারমিট কাঁকড়া মৃত শামুকের পরিত্যক্ত শক্ত খোলক সংগ্রহ করে আশ্রয় লাভের জন্য। ডিম থেকে পরিস্ফুটন হওয়ার পরেই যখন তারা ছোট কাঁকড়া আকার ধারণ করে, তখন থেকেই এই বিশেষ আচরণ করতে থাকে সমুদ্র উপকূলবর্তী পরিবেশের মধ্যে। সমুদ্রের তীর থেকে সমুদ্রের তলদেশের গভীরে যে সমস্ত ছোট থেকে বড় বিভিন্ন প্রজাতির শামুকের পরিত্যক্ত খোলক পড়ে থাকে সেগুলি এই হারমিট কাঁকড়ারা সংগ্রহ করে তাদের নতুন বাসস্থানের জন্য। সাংসারিক জীবনে অনিচ্ছুক সন্ন্যাসীরা যেমন যাযাবরের মতো কিছুদিন পরপর নিজেদের বাসস্থান বদলায়, তেমনই জীবন যাপনের কারণে এদেরকে সন্ন্যাসী কাঁকড়া হিসাবে ডাকা হয়। বয়সের সাথে সাথে এই কাঁকড়া নিজেদের শরীরের আকৃতি অনুযায়ী পরিবেশ থেকে পছন্দমাফিক দেহের খোলক খুঁজে নেয়, ঠিক যেমন আমরা পছন্দ মাফিক জামা পরে থাকি।

সমুদ্রের তলদেশ থেকে সমুদ্রের বালুতট অবধি এই কাঁকড়ার বাসস্থান বিস্তার লাভ করে। পরিবেশে খাবার খোঁজার জন্য

বিচরণের সময় সন্ন্যাসী কাঁকড়া তার শক্ত খোলকটিকে টানতে টানতে নিয়ে যায় বা হালকা হলে পিঠের ওপর রেখে তারা ঘুরে বেড়ায়। বড় হওয়ার সাথে সাথে খোলকটি তাদের শরীরে আটকে যায় এবং তারা পুরানো খোলকটি তখন ত্যাগ করে নিজেদের শরীর থেকে বড় আকৃতির খোলক বেছে নেয়, যার মধ্যে তাদের তলপেটটি খুব সহজেই ঢুকতে পারে। প্রতিবারই তারা দেহের আকৃতির বৃদ্ধির সাথে মিল রেখে এমনই খোলক বাছাই পর্বটি চালাতে থাকে পরিণত অবস্থা পর্যন্ত। এই কাঁকড়া নতুন একটি খোলক খুঁজে পেলে তারা আগে ভালোভাবে দেখে নেয় ভেতরে কেউ থাকছে কিনা। এদের এই খোলক পরিবর্তনটা হয়ে থাকে একজনের সাথে আর একজনের পাল্টাপাল্টির মাধ্যমে। একজন যখন খোলক ছেড়ে দেয়, তা ছোট আকৃতির অন্যজন নতুন করে গ্রহণ করে। আবরণ পরিবর্তনের মরসুমে দলে দলে এই হারমিট কাঁকড়ারা এক জায়গায় মিলিত হয়। তখন একে অন্যের ছেড়ে দেওয়া খোলক গুলিকে মাপ নিতে থাকে ও যে খোলকটি ঠিকঠাক ভাবে শরীরের মাপে হয়, সেই খোলকটি তারা বেছে নেয়। যদি কোন কাঁকড়া পছন্দ মাফিক উপযুক্ত খোলোক না পায় তখন তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে অন্য কাঁকড়ার খোলসত্যাগের জন্য। এই অপেক্ষার ক্ষেত্রেও তারা বেশ শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দেয়। সারিবদ্ধ ভাবে তারা বড় থেকে ছোট আকারে নিজেদের পর্যায়ক্রমিকভাবে এক রেখায় সাজিয়ে নেয়। সবচাইতে বড় আকারের কাঁকড়াটি যখন তার আবরণ ছেড়ে দেয় তখন তার খোলকটি তার থেকে ছোট আকৃতির কাঁকড়া দখল করে। এইভাবে সারিবদ্ধ কাঁকড়াগুলো একে একে নিজেদের খোলক ত্যাগ করে ও অন্যের খোলক ধারণ করে। অবশেষে সব থেকে ছোট আকারের কাঁকড়া তার দেহের সাথে মানানসই খোলক পেয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় পর্যায়ক্রমিক খোলক বিনিময় পদ্ধতি। এই সময় পুরো প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হতে সমস্ত সন্ন্যাসী কাঁকড়াদের যথেষ্ট সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখতে হয় ও অসাধারণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়, যা এই ক্ষুদ্রতম অমেরুদন্ডী প্রাণীদের থেকে আমরা শিখতে পারি।

পৃথিবীর মধ্যে 800টির ও বেশি সন্ন্যাসী কাঁকড়া প্রজাতি রয়েছে। তাদের বিচরণ ভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির শামুকের সাথে খোলক বিনিময়ের এই সুন্দর আচরণ লক্ষ্য করা যায় যা সত্যিই বিস্ময়কর। ভারতবর্ষের দক্ষিনে আরব সাগরের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ও বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায়, যেমন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অন্তর্গত বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ ও জি-প্লটের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা গেছে এদের বসতি।

... দশম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

জৈবপ্রযুক্তি: মানব কল্যাণে বহুমুখী প্রয়োগ

সুব্রত কুণ্ডু

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ বিগত কয়েকশত শতাব্দী ব্যাপী তার শ্রেষ্ঠত্বের ধারা বহন করে চলেছে আজন্মলালিত বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়ে। তার ফলস্বরূপ "বিজ্ঞান" নামক "মহীরুহ" টি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পল্লবিত হয়েছে। জীববিজ্ঞান হলো তারই একটি শাখা যা সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে সম্মোহিত করেছে নিত্যনতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে। জীবের ওপর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নীতিগুলির প্রয়োগ ঘটিয়ে জীববিদ্যার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল যাকে বলা হয় জৈবপ্রযুক্তি।

জৈবপ্রযুক্তির বিকাশকে আমরা প্রধানত দুই যুগে বিভক্ত করতে পারি—পুরাতন পরম্পরাগত জৈবপ্রযুক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তি। উপরোক্ত দুই প্রযুক্তির জন্য আমরা জীব কোষ ব্যবহার করেছি কাঙ্খিত দ্রব্য পাওয়ার জন্য। একটি বহুপ্রচলিত প্রবাদ আছে 'প্রয়োজনীয়তা হল সকল উদ্ভাবনের জননী'। বহুবছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন ধরনের প্রজনন কৌশল ব্যবহার করে আসছেন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও পশুর মধ্যে উন্নত বৈশিষ্ট্য লাভ করার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ উচ্চ দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরু বা উচ্চফলনশীল ফসল আমরা পেয়েছি বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ বা পশুর মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটিয়ে। পুরাতন বা প্রাচীন জৈবপ্রযুক্তিতে বিভিন্ন অনুজীব ব্যবহার করা হয়েছে সন্ধান প্রক্রিয়ার জন্য। আধুনিক প্রযুক্তিতে একটি জীবের জিন পরিবর্তন করে অন্য একটি জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি অর্জন করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। আধুনিক জৈব প্রযুক্তিতে প্রধানত আমরা বিভিন্ন রোগ নিরাময় বা কোন জীবের জিনগত পরিবর্তন করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উন্নতির দিকে বেশী নজর দিয়েছি। জৈবপ্রযুক্তিতে ব্যাপক হারে অগ্রগতি তুলনামূলক ভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা। প্রোটিনের আবিষ্কার হয় 1830 খ্রীষ্টাব্দে, এরও তিনবছর পরে বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম উৎসেচক নির্যাস করেন। 1965 খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক জেনেটিক্স এর জনক মেন্ডেল বংশগতির সূত্র আবিষ্কার করেন ও জেনেটিক্স গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই শতাব্দীর শেষের দিকে লুই পাস্তর এবং রবার্ট হুক অনুজীববিদ্যার গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার এই অসামান্য উন্নতি আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি উত্থানের পথ আরও প্রশস্ত করেছে। এরপর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইমিউনোলজি এবং জেনেটিক্স গবেষণার আরও উন্নতি শুরু হয় ডিএনএর গঠন ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার হবার পর। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক ডিএনএ সিকোয়েন্সিং, পলিমারেজ শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মতো নতুন পরীক্ষামূলক কৌশল এর মাধ্যমে ফরেনসিক এবং জৈব চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটেছে।

জৈবপ্রযুক্তির প্রধান বিভাগ গুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে । যদিও কৃষিকাজে জৈবপ্রযুক্তি বহুকাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে, তবুও চাষবাসে

জৈবপ্রযুক্তিতে মরুভূমিতে শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে

আধুনিকতম প্রয়োগ দেখা যায়। বর্তমানে কৃষকরা শ্রেষ্ঠ বীজ নির্বাচন ও ব্যবহার করে, মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমন করে উচ্চতর পরিমাণে শস্য ফলন করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত এই সবুজ জৈব প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হল জিন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিজ পদার্থের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার গুণগত মানের পরিবর্তন করা। মানব কল্যাণে জৈবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করা। যে পদ্ধতিতে জিনপ্রযুক্তির মাধ্যমে অণুজীব থেকে বিভিন্ন ওষুধ, ভ্যাকসিন, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়, তাকে লোহিত জৈবপ্রযুক্তি বলে। মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই সন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মদ্য জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন, আঙুরের চাষবাস ও পাঁউরুটি তৈরী করা হয়ে আসছে। এই সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে সভ্যতার সূচনা থেকেই সাদা জৈব প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। জৈব প্রযুক্তির এই শাখাতে আনুবীক্ষণিক জীব ও তার উৎসেচক ব্যবহার করে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পুরাতন পদ্ধতি গুলির বিকল্প পথ হিসাবে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য

জৈবপ্রযুক্তিতে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট নীল গোলাপ

জৈবপ্রযুক্তিতে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট জাপানের মিয়াসাকি আম

যেমন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু উৎসেচক প্রস্তুত করা হচ্ছে। সাদা জৈব প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্যগুলি হল কম শক্তির ব্যবহার করে ও অল্প পরিমাণ বজ্য দ্রব্য পরিবেশে নির্গত করা। স্বর্ণ-জৈবপ্রযুক্তি মূলত বায়োইনফরমেটিকসের ওপরে ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে যা জৈবপ্রযুক্তির একটি আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্র যেখানে জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো দ্রুত সাজানো যায় এবং তথ্য বিশ্লেষণ করা যায় কম্পিউটারের প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এটি অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা জৈবপ্রযুক্তি ও ওষুধশিল্পের মূল উপাদান তৈরিতে সাহায্য করে। নীল-জৈবপ্রযুক্তি মূলত সামুদ্রিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। এতে জৈব-জ্বালানি পরিশোধনের ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষণকারী মাইক্রো-শৈবাল ব্যবহৃত হয়। মরুভূমি এলাকার পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জৈবপ্রযুক্তি বাদামি-জৈবপ্রযুক্তি হিসাবে পরিচিত। জৈবপ্রযুক্তির এই শাখাতে বিশ্বের শুষ্ক এবং আধা-শুষ্ক অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করে কঠিন প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা করা হয়। জলের অপ্রতুলতা, উচ্চ মাত্রার সৌর বিকিরণ, স্বল্প জৈব পদার্থযুক্ত মাটি, কম আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং দিন এবং রাতের মধ্যে চরম তাপমাত্রার ব্যবধান মরুভূমি এলাকার জীবিত প্রাণীদের বেঁচে থাকার প্রধান অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে, জৈবপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে এই বাস্তুতন্ত্রে অভিযোজিত বাস্তুতন্ত্রের সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ ও তাদের জেনেটিক উত্তরাধিকার রক্ষা করা ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অতোধিক কার্বন নিঃসরণ জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাতে বহু উদ্ভিত ও প্রাণীর প্রজাতি বিলুপ্ত হতে চলেছে বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রন করা ধূসর-জৈবপ্রযুক্তির মূল লক্ষ্য।

জৈব প্রযুক্তির সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রয়োগ হল জীবাণু-অস্ত্র তৈরি করা যা অন্ধকার-জৈবপ্রযুক্তি নামে পরিচিত। জৈব সন্ত্রাসবাদ বা জৈবিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অণুজীব, ভাইরাস বা টক্সিনের প্রয়োগ জনস্বাস্থ্যে, গবাদি-পশু বা ফসলের ব্যাপক হারে ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম।

জৈবপ্রযুক্তিতে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির পদ্ম ও শালুক ফুল

বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো তাদের ক্ষমতা আরো কুক্ষিগত করার স্বার্থে যদি কৃত্রিমভাবে তৈরি জীবাণু অনান্য দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, তাহলে তা ডেকে আনবে মহামারি। সুতরাং জৈবপ্রযুক্তি মানব জীবনের সংকট ও সম্ভাবনার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। জীববিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞানের সুসংহত ব্যবহার জৈবপ্রযুক্তিকে আরও বেশি শক্তিশালী করে এমন এক নতুন এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখান থেকে হয়তো মানুষ নিজের দুঃখবোধকে জিন সম্পাদনা করে মুছে দেবে। ফলস্বরূপ বদলে যেতে পারে বিশ্ব রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, শাসন পরিকাঠামো ও মানুষে মানুষের সম্পর্ক। ●

লেখক ***ডঃ সুব্রত কুণ্ডু*** *রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও প্রোটিওমিক্স বিষয়ে গবেষণারত। ইমেল: Rkmvccollege@rkmvccrahara.org*

অষ্টম পৃষ্ঠার পর ...

কিন্তু বর্তমানে সমুদ্র সৈকতে বিভিন্ন প্লাস্টিক দূষণের কারণে হারমিট কাঁকড়া সহ বিভিন্ন প্রাণীরা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাসস্থান ধ্বংস ছাড়াও কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সুন্দর মৃত শামুকের খোলক গুলিকে সংগ্রহ করে নিজেদের ব্যবসার জন্য, যার ফলে এই সন্ন্যাসী কাঁকড়ার ঘর গুলি ধ্বংস হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রায় দেখা গেছে উপযুক্ত শামুকের খোলকের অভাবে সমুদ্রতটে পড়ে থাকা বিভিন্ন টিনের ক্যান, ভাঙ্গা কাঁচের বোতল, প্লাস্টিকের কৌটো—এই সমস্ত সন্ন্যাসী কাঁকড়ারা দখল করেছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। কিন্তু এই কৃত্রিম পদার্থ গুলিতে ঢুকে পড়ার জন্য তাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার ও জীবন যাপন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। তাই মানুষ নিয়ন্ত্রিত এই সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে সন্ন্যাসী কাঁকড়াদের অস্তিত্ব অন্যান্য প্রাণীদের মতনই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মানব সচেতনতাকে জাগ্রত করতে না পারলে এই প্রাণীটির অস্তিত্ব শীঘ্রই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। ●

লেখক ***ডঃ সমীর সর্দার*** *রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: Rkmvccollege@rkmvccrahara.org*

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার, জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ

অমিতেশ ব্যানার্জী

সমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য আমাদের সবার জীবনেই বিজ্ঞান চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতা একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি সমাজের কোনো অংশে বিজ্ঞানের আলো না পৌঁছয়, তাহলে সমাজের বাকি অংশেরও উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কবির ভাষায়,

পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

বিজ্ঞান সঞ্চারণার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল বিজ্ঞানকে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপনা। তাই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও সঞ্চারণার ভূমিকা অনস্বীকার্য। 2019 সালে যখন দেশব্যাপী সমস্ত স্থানীয় ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার উদ্যোগ নেওয়া হল, যাকে নাম দেওয়া হয়েছিল SCoPE (**S**cience **Co**mmunication, **P**opularisation and its **E**xtension)-ভাষা, তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম যে ভাষার কথা মনে এল, সেটা বাংলা। কারণ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার ঐতিহ্য অনেক পুরোনো, সমাজের গভীরে তার শিকড় ছড়িয়ে আছে। 2019 সাল থেকেই SCoPE-বাংলার যাত্রা শুরু যাদবপুর সি জি সি আর আই-তে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে। সম্মেলনের শীর্ষক ছিল "বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার, জনপ্রিয়করণ ও প্রসার: ভবিষ্যতের পথ"। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী এক সুসংহত বিজ্ঞান আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু বাদ সাধলো করোনা অতিমারী। বিজ্ঞান সঞ্চারণার ধরণ বেশ অনেকটাই বদলালো। বিশেষ গুরুত্ব পেল সামূহিক স্বাস্থ্যবিধি পালন ও অতিমারী মোকাবিলার পদ্ধতি। সভা, সেমিনার, কর্মশালার জায়গা নিল অন্তর্জাল ভিত্তিক বিজ্ঞান সঞ্চারণা। ধীরে ধীরে অতিমারীর প্রভাব কাটিয়ে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে ওঠার পর SCoPE-বাংলার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 2022 সালে যাদবপুর ভারতীয় জৈব রসায়ন সংস্থানে। শীর্ষক ছিল, "জাতীয় বাংলা বিজ্ঞান সঞ্চারক সম্মেলন"। ক্রমশ গতিলাভ করে বাংলার বিজ্ঞান সঞ্চারণা।

এই পথ ধরেই গত 26 শে অগাস্ট রহড়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল SCoPE-বাংলার পরবর্তী সম্মেলন। সম্মেলনের শীর্ষক ছিল "বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার, জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ: অতীতের ঐতিহ্য, বর্তমানের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশ"। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় এবং শান্তি ফাউন্ডেশন। সম্মেলনের সূচনায় স্বাগত ভাষণে মহাবিদ্যালয়ের অধক্ষ্য স্বামী কমলাস্থানন্দ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সঞ্চারণা ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার কথা বলেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন শান্তি ফাউন্ডেশনের কর্মাধক্ষ্য ডঃ নকুল পারাশর। সভায় সদ্য প্রয়াত বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ ডঃ সমর বাগচী, ডঃ বিকাশ কুমার সিনহা, শ্রী কল্যাণ কুমার দাসগুপ্ত ও ডঃ সি আর রাওকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করা হয়। ঐদিন ছয়টি লোকবিজ্ঞানের বই প্রকাশ করা হয়। বইগুলি হল, ডঃ মানস প্রতিম দাস রচিত 'বিজ্ঞান পঞ্চাশৎ', অধ্যাপক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'আলোকবিদ্যার ইতিকথা', ডঃ সুদক্ষিনা গুপ্ত রচিত 'শঙ্কুর সাক্ষাতে', অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার রচিত 'নির্বাচিত জনবিজ্ঞান প্রবন্ধ সংকলন', ডঃ তুহিন চ্যাটার্জী ও ডঃ সুজয় পাল রচিত 'ভেষজ উদ্ভিদ: ভারতবর্ষের একটি অমূল্য সম্পদ' এবং ডঃ বিকাশ চক্রবর্তী রচিত 'গণিতের দুনিয়ায় কিছুক্ষণ'। লেখকরা তাঁদের বক্তব্যে বইয়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

সম্মেলনের মূল পর্বে প্রথম প্যানেল আলোচনার বিষয় ছিল "বর্তমানের মূল্যায়ন"। এটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার, অধ্যাপক শঙ্করাশিস

মুখার্জী, শ্রী অভিজিৎ বর্ধন ও ডঃ মানস প্রতিম দাস। বিগত দিনগুলিতে বিজ্ঞান সঞ্চারণার কাজে আমরা কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি আর কোন কোন জায়গা এখনো অধরা রয়ে গেছে বা পরিকল্পনা মাফিক চলা যায় নি সে বিষয়ে বিশদ এবং মনোজ্ঞ আলোচনা হয় সম্মেলনের এই সত্রে।

মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর দ্বিতীয় আলোচনা সত্রের বিষয় ছিল “ভবিষ্যতের পথনির্দেশ”। সত্র পরিচালনা করেন ডঃ চিন্ময় কুমার ঘোষ। আলোচনা করেন শ্রীমতি অনুপমা সেনগুপ্ত, শ্রী সুশান্ত মজুমদার, ডঃ সমর চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত নাট্যকার ও পরিচালক শ্রী চন্দন সেন, স্বামী কমলাস্থানন্দ ও ডঃ নকুল পারাশর। শ্রী সেন বিজ্ঞান সঞ্চারণার মাধ্যম হিসাবে নাটক বা অন্যান্য কলা মাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, এতে বিজ্ঞানকে আরও আকর্ষণীয়ভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। বাংলায় বিজ্ঞান সঞ্চারণার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও তার উপায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে বক্তাদের আলোচনায়। সম্মেলনে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যেও অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুটি সত্রেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের শেষ পর্বে শান্তি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের পাঁচজন মেধাবী ছাত্রকে শান্তিদেবী ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়। তাঁদের হাতে বৃত্তির সংজ্ঞাপত্র তুলে দেন স্বামী কমলাস্থানন্দ। মহাবিদ্যালয়ের উপাধক্ষ্য স্বামী বেদানুরাগানন্দের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে একদিনের এই সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সভা পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলেন ডঃ তুহিন চ্যাটার্জী।

বিজ্ঞানের খবর

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জাতীয় সেমিনার

নিতাই শ : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ছাত্রছাত্রী, মহিলা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের ভেতর বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিজ্ঞানপ্রসার ও শান্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় হলে ২৬ আগস্ট সারাদিন এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। হাজির ছিলেন শান্তি ফাউন্ডেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ড. নকুল পরাশর আর মিশনের অধ্যক্ষ কমলাস্থানন্দ মহারাজ। রাজ্যের নানান প্রান্তের নির্বাচিত প্রায় শতাধিক বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান লেখক সংগঠক ও সম্প্রসারক। এদিন বিজ্ঞান প্রসারের প্রকাশনায় ৬টি বই বেরোয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এই ৬টি বই – ‘বিজ্ঞান পঞ্চাশৎ’ ড. মানসপ্রতিম দাশ, ‘আলোক বিদ্যার ইতিকথা’ ড. গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, ‘শঙ্কুর সাক্ষাতে’ ড. সুদক্ষিণা

আজকাল ৭

কলকাতা রবিবার ২৭ আগস্ট ২০২৩

বিজ্ঞান প্রসারের উদ্যোগ

আজকালের প্রতিবেদন

নাটক, সিনেমার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়ানোর কথা বললেন নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দন সেন। শনিবার খড়দার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ ও শান্তি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারণ নিয়ে আয়োজিত সভায় তিনি এ কথা বলেন। ছিলেন ফাউন্ডেশনের সিইও ড. নকুল পরাশর এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী কমলাস্থানন্দজি মহারাজ–সহ রাজ্যের প্রায় একশো বিজ্ঞানকর্মী ও লেখক। ড. ভূপতি চক্রবর্তী জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখালেখির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিজ্ঞান প্রচারে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও দুর্বলতা বিষয়ে আলোকপাত করেন ড. মানস প্রতিম দাস। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে বিজ্ঞানকর্মীর ভূমিকা মনে করিয়ে দেন অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার। এদিন ছয়টি বিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রকাশিত হয়েছে।

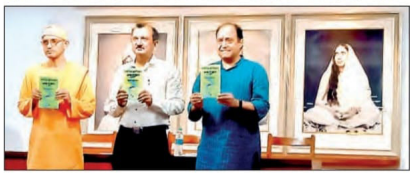

*লেখক **শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী** বিজ্ঞানকর্মী ও এই পত্রিকা প্রকাশনার সাথে যুক্ত। ইমেল: amiteshbanerjee1@gmail.com*

বিজ্ঞান প্রচারে

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজে বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারণ নিয়ে আয়োজিত একটি সভায় এ মন্তব্য করেন নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দন সেন। কলেজ এবং শান্তি ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই সভা আয়োজন করে। ছিলেন ফাউন্ডেশনের সিইও নকুল পরাশর এবং কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী কমলাস্থানন্দজি মহারাজ-সহ রাজ্যের শতাধিক বিজ্ঞানকর্মী ও বিজ্ঞান লেখক। আলোচিত হয় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্প্রচারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশা। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল বাংলা ভাষায় লেখা বইয়ের প্রকাশও। পাঁচ জন স্নাতক স্তরের পড়ুয়াকে শান্তি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদানও করা হয়।

স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান, কম খরচে উদ্ভাবন

বিজ্ঞানচর্চার এক কার্যকরী অভিমুখ

প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ী

স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান/উদ্ভাবন (Frugal Science/Innovation)-এর মূল কথা

প্রবন্ধের নাম শুনে কেমন একটা সস্তা সস্তা ব্যাপার মনে হচ্ছে, তাই না? তবে এই 'স্বল্প ব্যয়ে' প্রস্তুত সামগ্রী মানে কিন্তু খেলো নয়। সমাজ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সর্বোপরি নেতৃত্বদানের মতো বিভিন্ন পথে একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যানের দুই চাকা হল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির প্রগতি। তাহলে মাঝখানে এই 'উদ্ভাবন (innovation)' এর কি কোন আলাদা গুরুত্ব আছে? আলবৎ আছে। না না, আমি বলছি না! বলছে 2017 সালের United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) এর রিপোর্ট: এই উদ্ভাবন হল ঐ যানের তিন নম্বর চাকা যার ভূমিকা প্রায় ক্ষেত্রে গুপ্ত, কিন্তু প্রগতির যানকে স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তা অন্যতম চালিকা শক্তি। কিন্তু এই 'কম খরচে' শব্দগুচ্ছ যত গোলমেলে! কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। আমরা জেনেছি উন্নত বিজ্ঞানচর্চা উপহার দেয় উন্নত মানের উদ্ভাবন। তাহলে কি বিজ্ঞানের সামগ্রিক উন্নতি মানেই কম খরচে উদ্ভাবন বা প্রযুক্তির উন্নয়ন? কখনো এটা পুরো সত্যি হতে পারে না। তবে একটি পর্যায় অব্দি সত্যি। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখি, পাহাড়ের নিচে থাকা আধুনিক রণসাজে সজ্জিত বিশাল মোগল বাহিনীকে নিজেদের প্রতিরক্ষার তাগিদে অল্পসংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা অনেক সময় ছত্রভঙ্গ করেছেন শুধুমাত্র পাহাড় থেকে অনবরত পাথর ফেলে; এটাই ছিল রাজপুতদের উদ্ভাবন। আবার হালে, প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম খরচে চন্দ্রযান-3 পাঠানো ভারতের দিক থেকে বিশাল উদ্ভাবন। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি (Sustainable Development Goals) আলোচনা করলে দেখবো উদ্ভাবনীমূলক উন্নত প্রযুক্তির ভূমিকা সেখানে এক স্তম্ভের মতো। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে অনাহারের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা ও সাথে শারীরিক পুষ্টির মান বাড়ানো। এই লক্ষ্যে বিজ্ঞানের যাত্রাপথে নিজের মতো চেষ্টা করে যাচ্ছে কিছু মানুষ। আশেপাশের স্থানীয় সমস্যা কিংবা কোন জলবায়ু বা পরিবেশগত সমস্যা কিংবা কোন বিশ্বব্যাপী সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে কাজ করছেন অনেকে। এসব কাজে বহুজনের উদ্দেশ্য থাকে সরঞ্জামগুলি অত্যন্ত কম খরচে তৈরি করার, আর তা কর্মদক্ষতার মানের অবনমন করেই; অর্থাৎ সরঞ্জামগুলি যাতে উন্নত ও দামী যন্ত্রপাতির সাথে পাল্লা দিতে পারে। আর সাথে সাথে এই কাজগুলো যতটা সম্ভব মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার উপায় খুঁজে বেড়ান তাঁরা। আসলে বিজ্ঞান শুধু জানার জন্য নয়, বিজ্ঞান মূলত শেখার বিষয়। শেখাটা হয় প্রধানত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সুতরাং, আপনি কীভাবে অভিজ্ঞতা আহরণ করবেন, তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি এমন বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তৈরি করতে পারেন যা এত সাশ্রয়ী মূল্যের, একটি দোকান থেকে খাতা-পেন কেনার মতো। ফলে বিশ্বের এক বড় অংশ জুড়ে মানুষ আপনার বিজ্ঞান চর্চার সুফল পেতে পারেন। এই হল স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান (Frugal Science) এর মূল কথা, যার ভিত্তিতে রয়েছে কম খরচে উদ্ভাবন (Frugal Innovation)। একটি দর্শন হিসাবে 'স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান' এখন পরিচিত, আর তা এখন একটি উদ্ভাবনীমূলক গবেষণা ক্ষেত্র।

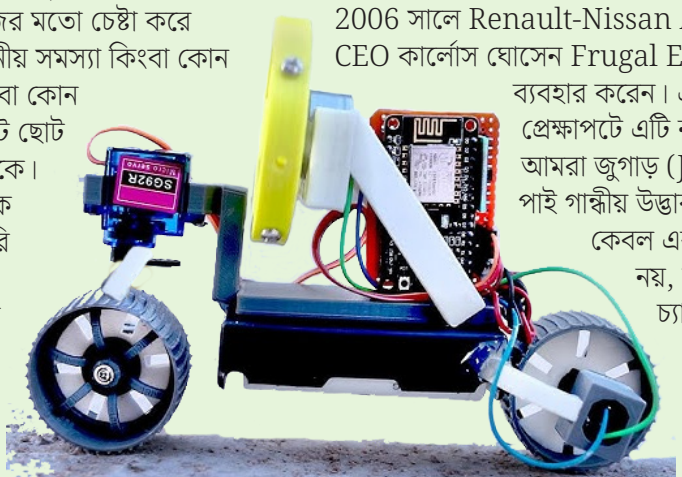

স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ইতিহাসগত প্রেক্ষাপট

বর্তমানে বহুল আলোচিত এই 'কম খরচে উদ্ভাবন' সংক্রান্ত সংজ্ঞা অনেকেই দিয়েছেন। তবে 2016 সালে দেওয়া সংজ্ঞা অনেকটা সম্পূর্ণ। তাতে লেখকরা বলেছেন: "a resource-scarce solution (i.e., product, service, process, or business model) that is designed and implemented despite financial, technological, material or other resource constraints, whereby the outcome is significantly cheaper than competitive offerings (if available) and is good enough to meet the basic needs of customers who would otherwise remain un(der)served" (M. Dabic et al., *Journal of Business Research,* 142 (2022) 914)। এই Frugal Innovation নামটা কে বেছেছিলেন তা জানা যায়না। কিন্তু 2006 সালে Renault-Nissan Alliance কোম্পনির CEO কার্লোস ঘোসেন Frugal Engineering নামটি ব্যবহার করেন। এ প্রসঙ্গে দেখা যায় ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এটি নতুন নয়। ইতিহাস ঘেঁটে আমরা জুগাড় (Jugaad) এর কথা পাই। পাই গান্ধীয় উদ্ভাবনী ভাবনার কথা। 'জুগাড়' কেবল একটি উদ্ভাবনী সমাধানই নয়, সম্পদের সীমাবদ্ধতার চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে লড়াই

করে সমাধান বের করার একটি অনন্য উপায়। তা ব্যক্তির দ্বারা হোক বা কর্পোরেটেই করুক। এইরকম ভাবনা ও কাজ দেশীয় ভাবে শুধু উন্নত দেশে নয়, এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশে—ব্রাজিলে 'গাম্বিয়াররা' (Gambiarra) এবং কেনিয়াতে 'জুয়া কালী' (Jua Kali)। জুগাড়ের উদাহরণ হিসাবে তৃণমূলস্তরের অনেক উদ্ভাবনকে চিহ্নিত করা যায় যেগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে তৈরী ও তার ব্যাপক মূল্য রয়েছে। আর ভারত, চীন বা অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৃণমূলস্তরের উদ্ভাবনী আজকের দিনের 'কম খরচে উদ্ভাবন' নীতির পথপ্রদর্শক। তা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণই হোক বা চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ের কাজ হোক, একটা বিশাল পরিধি জুড়ে তৃণমূলস্তরের এই উদ্ভাবনী কাজে লাগাচ্ছেন বহুজন।

এই 'কম খরচে' বারে বারে বলার জন্য কখনো আমাদের মনে হতে পারে এই উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তিগুলো নক্সা করা অত্যন্ত সোজা। ভাবনা ও মডেলের ধরন এতটাই সোজা তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই সন্দেহ জন্মানো স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক একটা পলিইথিলিন টেরেফথ্যালেট (PET) বোতলে রাখা জল প্রখর সূর্যালোকে রেখে জীবাণুমুক্ত করার একটা প্রচলিত পদ্ধতি হলো Solar Water Disinfection (SODIS)। এক রকম 1980 সাল থেকে এই পদ্ধতি চালু ছিল কিন্তু অতটা জনপ্রিয় ছিল না। গত শতাব্দীর শেষ দশকে সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাকোয়াটিক রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি এই পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালায় এবং শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল তৈরি একেবারে শূন্য দামের একটি কার্যকরী অথচ সরল পদ্ধতি হিসেবে SODIS কে ঘোষণা করেন। একটি পরিষ্কার রোদমুখর দিনে 500 থেকে 600 মিলি পরিষ্কার একটি PET বোতলে জল রেখে দিলে তার মধ্য দিয়ে অতিবেগুনি রশ্মি যেতে পারে যা জলে থাকা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্রোটোজোয়া ও অন্যান্য জীবাণুগুলোকে নষ্ট করে জলকে জীবাণুমুক্ত করে। 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে জলের তাপমাত্রা গেলেই অতিবেগুনী রশ্মি জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে বিক্রিয়শীল অক্সিজেন প্রজাতি (Reactive Oxygen Species) তৈরি করে যা জীবাণুগুলোকে সহজে ধ্বংস করে ফেলে ও প্রায় জীবাণুমুক্ত জল পাওয়া যায় বোতলটি যদি ছ'ঘন্টা ধরে রোদে রাখা যায়। উপরের পদ্ধতিটা জেনে বহুজনের মনে হতে পারে, এই স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান কিংবা কম খরচে উদ্ভাবন এর ক্ষেত্রে বিজ্ঞান খুব সরলীকৃত এবং বৈজ্ঞানিক কাজ করার দক্ষতা এখানে খুব বেশি প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিষয়টি একেবারেই সেরকম নয় বরং বলা যায় খুব বিস্তৃত ক্ষেত্রে গ্রহণীয় এমন কম দামে উদ্ভাবন প্রযুক্তি তৈরি হতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বোধ এবং জ্ঞান বেশ গভীর হলেই। বরং মার্সেল প্রাউস্ট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে যেভাবে বলেছেন, মিতব্যয়ে উদ্ভাবনকে সেভাবেও দেখা যেতে পারে: "The real voyage the real voice of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes". সত্যিই তো বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানচর্চা বা বিজ্ঞান গবেষণা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাকেন্দ্রে আবদ্ধ না রেখে এই 'স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান' বা 'কম খরচে উদ্ভাবন' এর বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ভাবনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসার ঘটালে দেশ বা জাতির পক্ষে তা সবচেয়ে মঙ্গলকর। আমাদের চারদিকের বহু সমস্যা নিয়ে বহু জনের ভাবনা এইরকম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও প্রায়োগিক দক্ষতার উপর নির্ভর করে যদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলে তাহলে অনেক কম বিনিয়োগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আশ্চর্যজনক সমাধান আমরা হাতেনাতে পেতে পারবো। এই দিক থেকে সস্তায় বিজ্ঞান চর্চার অভিমুখ আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার এক বিকল্প পথ হতে পারে। আর এই পথে হেঁটে যারা এই বিষয়ের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে ভারতের কয়েকজনের কাজকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

স্বাধীনোত্তর ভারতে শুধু রেডিও জ্যোতির্বিদ্যায় দিশারীর ভূমিকায় নয়, 'স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান' চর্চা বিষয়েও তিনি একটি যুগের সৃষ্টি করেছেন।

আলোচিত ধারার বিজ্ঞানচর্চার পথপ্রদর্শক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস ও আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়। তেলের খুব পাতলা অন্তরক ফিল্মে ঢাকা পারদযুক্ত একটি ধাতব কাপ দিয়ে প্রথম জনের তৈরী নতুন কোহেরার, ক্রেসকোগ্রাফ, গ্যালেনা কেলাস ডিটেক্টর, হর্ন এন্টেনা এবং দ্বিতীয়জনের পরামর্শে বেঙ্গল কেমিকাল তৈরী বহু অত্যাবশ্যকীয় জিনিস—এগুলি বিজ্ঞান আলোচনায় বহুলচর্চিত। তেমনই আর একজন হলেন বিজ্ঞানী গোবিন্দ স্বরূপ। বিজ্ঞানী সোমক রায়চৌধুরী গোবিন্দ স্বরূপের স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্যে মন্তব্য করেছেন, স্বাধীনোত্তর ভারতে শুধু রেডিও জ্যোতির্বিদ্যায় দিশারীর ভূমিকায় নয়, 'স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞান' চর্চা বিষয়েও তিনি একটি যুগের সৃষ্টি করেছেন। ফেলে দেওয়া, অব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে অনন্য সব জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন এবং পাশাপাশি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন এবং ভাবিয়েছেন যে, এভাবেও স্বপ্ন সত্যি করা যায়। শিক্ষক কৃষ্ণন তাঁকে 3 সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ইলেক্ট্রন স্পিন অনুনাদের পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম তৈরীর কাজে লাগিয়েছিলেন। যদিও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম তৈরীর কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। স্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিত্যক্ত সরঞ্জাম থেকে জাতীয় পদার্থবিদ্যা ল্যাবরেটরী (NPL) এর পাওয়া বেশ কয়েকটি রাডার সেট থেকে অংশগুলি জোগাড় করে

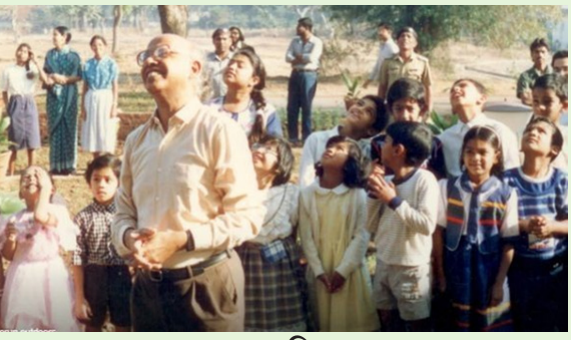

অধ্যাপক গোবিন্দ স্বরূপ—স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞানচর্চার দিশারী।

18 মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করতে সফল হন। এখানেই প্রথম নতুন কিছু বিকাশের কাজে স্বরূপের হাতে খড়ি, হাত নোংরা করে শেখার অভ্যাস তৈরী করা। কৃষ্ণনই স্বরূপকে রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথে নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে তিনি একটি অবিস্মরণীয় চিহ্ন তৈরি করেছিলেন।

স্বল্প ব্যয়ে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, অনুশীলনী ও ফলশ্রুতি

ওপরের আলোচনার সূত্র ধরে 'সস্তায় বিজ্ঞান' চর্চার দুটি উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট—(1) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চা, (2) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের কল্যাণ। জগদীশচন্দ্র ও গোবিন্দ স্বরূপের কাজ ছিল প্রথম ধারার। এই ধারায় আরেকটি নাম যোগ করা যায়—যিনি হলেন অধ্যাপক দয়াপ্রসাদ খাণ্ডেলওয়াল। যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফেলে দেওয়া ফটো মাল্টিপ্লায়ার টিউব, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি জোগাড় করে পিএইচডি ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে তাঁর গবেষণার প্রয়োজনীয়

অধ্যাপক ডা. প্রমোদ করণ শেঠি তাঁর উদ্ভাবিত সামগ্রীর সাথে।

ফ্লুরোমিটার সাফল্যের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন। আর অন্যদিকে, প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম ধারার সাথে সাথে দ্বিতীয় ধারায় কাজ চালিয়ে গেছেন সমান্তরাল ভাবে। আমাদের হয়তো মনে পড়ছে অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রনকে। 1981 সালে তেলেগু ছবি 'ময়ূরী' তে (হিন্দিতে 'নাচে ময়ূরী' 1984) তাঁকে নাচতে দেখা গেছে কৃত্রিম 'জয়পুর পা' পরে। কৃত্রিম এই অঙ্গ বানিয়ে ছিলেন জয়পুরের সোয়াই মান সিং মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে অর্থোপেডিকসের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডা. প্রমোদ করণ শেঠি। সালটা 1968। রামচন্দ্র শর্মা নামে এক স্থানীয় দক্ষ কর্মীর সাহায্যে তিনি স্বল্প মূল্যে 'জয়পুর পা' তৈরি করতে সমর্থ হন। পরে সহযোগী গবেষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত হয় আমাদের দেশের আই

প্রশান্ত গাদে ও তাঁর উদ্ভাবিত কৃত্রিম হাতের সাথে করমর্দন।

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ড. নবীন খান্না।

আই টি মাদ্রাজ এবং জাতীয় রসায়ন ল্যাবরেটরি (NCL)। দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন সংস্থা (DRDO) এর আর্থিক আনুকূল্যে উন্নত গবেষণার ফলে এই 'জয়পুর পা' হাঁটা, সাইকেল করা, উঁচুতে চড়া সবরকম কাজের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর বলে বিবেচিত হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ড্রপ আউট মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ার প্রশান্ত গাদে-এর হৃদয় নড়েচড়ে বসেছিল একটি তথ্যে—আমাদের ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ উপরের অঙ্গ হারায়। এইসব মানুষদের দৈহিক সম্পূর্ণতা আনার জন্য মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি তৈরি করে ফেলেন একটি রোবটিক কৃত্রিম হাত (Inali arm)। ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রপ আউট হয়েও এর জন্য তিনি বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছিলেন রোবোটিক্সের। এই কৃত্রিম হাতের দাম প্রায় 50000 টাকা, যেখানে চিন বা আমেরিকা এবং ইউরোপে সমান কার্যকর কৃত্রিম হাতের দাম প্রায় 10 থেকে 12 লাখ টাকা।

এরপর আসি ড. নবীন খান্নার কথায়। নবীন হলেন International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) এর এক প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞান (আণবিক স্তরে) বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ড. খান্নার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল একটি অনেক কম খরচের (140 টাকা মাত্র) কিট (Dengue Day 1) যা প্রথম দিনেই 15 মিনিটের মধ্যে ডেঙ্গু নির্ণয় করতে পারে। সাধারণত, ডেঙ্গু নির্ণায়ক পরীক্ষার ফলাফলগুলি পেতে 4 দিন থেকে 2 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। কিটটির বৈশিষ্ট্য হল, কিটটি ডেঙ্গু ভাইরাস কোন পর্যায়ে (প্রাথমিক বা মাধ্যমিক) আছে তা সনাক্ত করতে পারে। আর মজার বিষয় হল যদি কারও জ্বর না থাকে, তাও কিটটি বলতে পারে যে ব্যক্তির কোনও ডেঙ্গু সংক্রমণ হয়েছে কিনা। আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য, প্রথমে ভারত সরকার ড. খান্নার এই কম দামের এই কিটটি কিনতে চাননি। কিন্তু 2013 সালে ডেঙ্গুর মারাত্মক সংক্রমণ ঘটলে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি এই কিট সরকার কিনতে বাধ্য হয়। আর কিটের যোগ্যতা ও কার্যকারিতা পরে মেনে নেওয়া হয়।

আই আই টি মাদ্রাজের স্নাতক হওয়ার বছরে সর্বোত্তম ছাত্র হিসাবে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তারপর ম্যাসাচুসেট

ড. ধনঞ্জয় দেন্দুকুরি।

ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পিএইচডি পেয়ে ভারতে ফেরেন ড. ধনঞ্জয় দেন্দুকুরি। প্রকৌশলের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি ভারতে ফিরে এসেছিলেন যে অনুন্নত বাজারের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন অবশ্যই স্থানীয়ভাবে করা উচিত ও করা সম্ভব। 2009 সালে ভারতের বেঙ্গালুরুতে প্রতিষ্ঠিত আচিরা ল্যাব (Achira Lab) এর তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তারা পয়েন্ট-অফ-কেয়ার রোগ নির্ণয়ের জন্য ভারতের প্রথম মাইক্রোফ্লুইডিক্স-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এবং বিশ্বের প্রথম ওভেন-ফেব্রিক ভিত্তিক পয়েন্ট-অফ-কেয়ার প্ল্যাটফর্মও তৈরি করেছে। ড. দেন্দুকুরির নিজের কথায়, আমরা গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জস কানাডা থেকে অনুদান পেয়েছি একটি চিপ তৈরির জন্য যা সাশ্রয়ী মূল্যের হবে এবং স্থানীয়ভাবে দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তৈরী কিংবা তার কাজের উন্নতি ঘটনা যাবে। সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে চিপ বুনতে তাঁতিদের (কাঞ্চিপুরম থেকে) ব্যবহার করা হয়েছিল। সুতরাং আমাদের কিছু চিপ আসলে বোনা ফ্যাব্রিক যা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ক ধরে রাখে। আমরা কৈশিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য টেক্সটাইলের বয়ন বৈশিষ্ট্যগুলি কাজে লাগাই। একটি চিপের খরচ প্রচলিত ডায়াগনস্টিক চিপের তুলনায় প্রায় 90% কম। এমনকি উনি বলছেন—ধরুন, আমরা পরীক্ষার একটি তালিকা করার পরিকল্পনা করছি, আমরা কি আঙ্গুলে সূচ ফুটিয়ে পাওয়া একটি রক্তবিন্দু দিয়ে সমস্ত পরীক্ষা করতে পারি? হ্যাঁ পারি। আমাদের লক্ষ্য ছিল—একসাথে যেমন অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়কর এবং অন্যদিকে রোগ নির্ণয়ের দিক থেকে সর্বোত্তম করা। আমরাও 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে এই সমস্ত পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম।

শেষে বিশেষ একজনের কথা বলব। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক মানু প্রকাশ। তাঁর গলায় বিশেষ করে গত কয়েক বছর ধরে ধ্বনিত হচ্ছে এই 'সস্তায় বিজ্ঞান' চর্চার বিষয় ও গুরুত্ব। এইদিকে মানব প্রকাশের বিশেষ উৎসাহ ও গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সুবিধা যতটা সম্ভব কম খরচে বিশ্বের জনগণের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। ডক্টর প্রকাশ নিজেই তুলে ধরেছেন এই কম খরচে বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি ও মহত্ত্ব। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ডাটা সংগ্রহ করা এবং তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়েও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নেওয়া এবং বিজ্ঞানের আসল স্বাদ নেওয়া। এই Frugal Science সম্পর্কে বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ড. প্রকাশ মন্তব্য করেছেন: "the Novelty of frugal science lies in looking at things differently sometimes what we are searching is right in front of us we only need to change our perception to 'see' it"। ব্যক্তিগত সাক্ষাতে ড. প্রকাশ জানিয়েছেন কোন ঘটনা ও ভাবনা থেকে তাঁর এই বিষয়ে নিজস্ব বিজ্ঞান দর্শন প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর নিজের ভাষায়: "আমি যখন উগান্ডায় কাজ করছিলাম, তখন আমি অ্যালেক্স নামে একজন মাইক্রোবায়োলজিস্টের কাছ থেকে একটি শিক্ষা নিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি এমন প্রযুক্তির প্রত্যাশা রাখি যা আমাকে একটি গাছের নীচে ডায়াগনস্টিক চালানোর অনুমতি দেয়'। কথাটা আমার মনে ধরেছিল। আমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এক ডলারের দামে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না এমন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা কি সম্ভব?' এটি ফোল্ডস্কোপ নামে পরিণতি ও পরিচিতি পেয়েছিল। একটি মাইক্রোস্কোপ যা কাগজ ভাঁজ করা ওরিগামি স্টাইলের কাট-আউট শীট থেকে তৈরি। এটি এমন কিছু যা একটি শিশু তৈরি করতে পারে এবং এটি এমন কিছু যা আমরা খুব বড় স্কেলে উৎপাদন করতে পারি। লোকেরা রোগ নির্ণয় করতে বা কেবল তাদের চারপাশের বিশ্বকে অন্বেষণ করতে ফোল্ডস্কোপ ব্যবহার করতে পারে। আজ পর্যন্ত, আমরা 130 টি দেশে প্রায় 80000 ফোল্ডস্কোপ (বর্তমানে সংখ্যা কুড়ি লাখ ছাড়িয়েছে) মাইক্রোস্কোপ ছড়িয়েছি। আমরা এর এমন সব ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করছি যা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। নাইজেরিয়ার একটি শিশু জাল

ড. মানু প্রকাশ ও ফোল্ডস্কোপ (ইনসেট) হাতে পড়ুয়ারা।

'এক ডলারের দামে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না এমন মাইক্রোস্কোপ তৈরি করা কি সম্ভব?' এটি ফোল্ডস্কোপ নামে পরিণতি ও পরিচিতি পেয়েছিল।

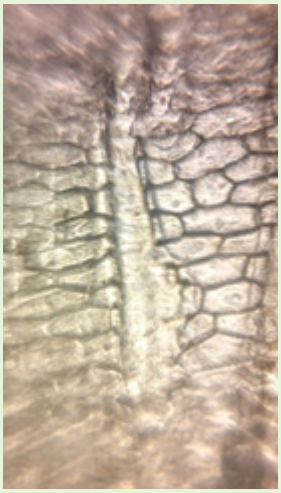

ফোল্ডস্কোপ দিয়ে তোলা পেঁয়াজের ছবি। কোষ প্রাচীর ও কিছু কোষীয় উপাদান দেখা যাচ্ছে।

মুদ্রা সনাক্ত করতে ফোল্ডস্কোপ ব্যবহার করে এবং ভারতের কৃষকরা উদ্ভিদের রোগজীবাণু সনাক্ত করে রোগাক্রান্ত ফসলগুলি তাড়াতাড়ি কেটে ভালো ফসল থেকে আলাদা করতে।" এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এই অভিনব মাইক্রোস্কোপ বানাতে খরচ হয় মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা (এক ডলার)। একটি উন্নত মানের অনুবিয়াশান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দামের অঙ্ক তো হাজারে হয়। এই কাগজের অণুবীক্ষণ যন্ত্র (বিবর্ধন ক্ষমতা 140x) এত সস্তা হওয়ার কারণ এতে বিশেষ কিছুই লাগছে না—লাগছে একটা লেন্স ও আর কাগজ ভাঁজ করার কৌশলে বাকি মাইক্রোস্কোপটা তৈরী।

ড. প্রকাশের ল্যাবে তৈরী হয়েছে আরো নানা বিস্ময়কর উদ্ভাবন। (1) পেপারফুজ যা একটি সেন্ট্রিফিউজ মেশিন যা জৈব নমুনাগুলিকে উচ্চ গতিতে ঘুরিয়ে ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে দ্রবণ আলাদা করে দেয়। পেপারফুজ 125000 আরপিএম এ ঘুরতে পারে। একটি খেলনা দেখে এই উদ্ভাবন যা তৈরী করতে মাত্র 20 সেন্ট লাগে, যেখানে একটি বেশ ভালো সেন্ট্রিফিউজ কিনতে কয়েক হাজার ডলার লাগে। (2) রসায়নের কিট হিসেবে মাত্র 5 ডলারে পাঞ্চকার্ড মাইক্রোফ্লুইডিক্স তৈরী প্রস্তুত। (3) ভেক্টর চিপ (Abuzz) তৈরী হয়েছে বিভিন্ন মশা সনাক্ত ও চিহ্নিত করতে। (4) ওস্ক্যান (Oscan)—মুখে ক্যান্সার হতে পারে এমন কোন গর্ত থাকলে তা স্মার্টফোনের সাহায্যে স্ক্যান করার যন্ত্র। (5) ম্যালেরিয়াস্কোপ (MalariaScope)—খুব কম পয়সায় ম্যালেরিয়া নির্ণায়ক পরীক্ষার জন্য যন্ত্র। (6) প্ল্যাঙ্কটনস্কোপ (PlanktonScope)—মহাসাগরের জীববৈচিত্র পরখ করার যন্ত্র।

একেবারে শেষে এই বিষয়ে সাফল্য পেয়েছেন এমন দুজন বাঙালির কথা বলে শেষ করব। প্রথম জন হলেন কোয়েম্বাটুরের অমৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শান্তনু ভৌমিক। DRDO ও প্রতিরক্ষা বিভাগের এক যৌথ প্রকল্পে অধ্যাপক ভৌমিক বানাতে সক্ষম হন এক বিশেষ বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট; যার ওজন মাত্র দেড় কেজি এবং যার ওজন আগের ব্যবহৃত জ্যাকেটের থেকে 7–8 গুণ কম। কুড়িটি স্তরে তৈরী এবং ভেতরে কার্বনতন্তু নিয়ে অভিনব এই জ্যাকেটটির দাম আগের দামের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ মাত্র 50 হাজার টাকা। অন্যজন হলেন IISER কলকাতার জীববিদ্যা বিষয়ের অধ্যাপক পুণ্যশ্লোক ভাদুড়ি। অধ্যাপক ভাদুড়ির উদ্ভাবন মানুষের বর্জ্য যথাযথ ট্রিটমেন্ট নিয়ে। তিনি এক মাইক্রোবিয়াল পদ্ধতি বের করেন যা আগেকার তুলনায় আর্থিক ভাবে অনেক সাশ্রয়ী। আসলে এই ধরনের কোন বস্তু বাজারে আগে ছিল না। এই ট্রিটমেন্টের খরচ ৪০ ঘনমিটার একটি সেপটিক ট্যাংকের জন্য মাত্র দেড় হাজার টাকা। এইরকম বড় মাপের সেপটিক ট্যাংকের ক্ষেত্রে এই খরচ আগে পড়ত প্রায় এক লাখ টাকা। সেই হিসাবে ছাত্রদের নিয়ে তাঁর এই গবেষণা কম খরচে উদ্ভাবনের অন্যতম এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অধ্যাপক পুণ্যশ্লোক ভাদুড়ি

DRDO ও প্রতিরক্ষা বিভাগের এক যৌথ প্রকল্পে অধ্যাপক ভৌমিক বানাতে সক্ষম হন এক বিশেষ বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট; যার ওজন মাত্র দেড় কেজি

অধ্যাপক শান্তনু ভৌমিকের বানানো বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট

উপসংহার

তাই শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানেই নয়, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়গুলিতেও এই ধারণা পড়ুয়াদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে যে, বিজ্ঞানের কাজ সবসময় ব্যয়বহুল নয়। প্রয়োজন শুধু শিশুর মতো কৌতূহল। আরও কৌতূহলী হলে তাদের চোখে জগত নতুন ভাবে ধরা দেবে। কৌতূহলকে তাই বলা হয় আবিষ্কারের জননী। আর্থিক ভাবে সাশ্রয়ী বিজ্ঞানচর্চার আবহ ঘরে ঘরে উদ্ভাবক গড়ে তুলবে, যে যার কৌতূহলের উত্তর খুঁজবে। আমাদের চারপাশের প্রচুর সমস্যা জরুরীভাবে সমাধানের রাস্তা মিলবে, আর তার অনেকগুলি হবে সহজ ভাবে ও কম খরচে। নিজের জন্য বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একের ও অপরের সাশ্রয়ী উদ্ভাবনগুলো ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বের কোণে কোণে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসহ সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন অভিমুখে পরিষেবা ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামীণ ভারতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং স্থানিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচুর জ্ঞান রয়েছে গ্রামীণ জনগণের। কৃষক, কারিগর, বনবাসী এবং মহিলা—আমাদের গ্রামীণ জনগণের সময়ের সাথে পরীক্ষিত জ্ঞান একটি মহান অদৃশ্য সম্পদ যা একটি মানবিক এবং পরিবেশগত বিশ্বের দিকে এগোনো জন্য ব্যবহার করা উচিত। পয়ঃনিষ্কাশন, আবাসন, সামাজিক কল্যাণ ও জীবিকার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাঠামোতে তৃণমূলস্তরের সৃজনশীলতা, কম খরচে উদ্ভাবন, টেকসই নকশা এবং পারস্পরিক আন্তঃসংযোগ বাড়াতে হবে। এইভাবে গড়ে উঠুক নতুন ভারত নব নব উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে। ●

লেখক ***ডঃ প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ী*** *কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক। ইমেল:* *ppcontai@gmail.com*

গণিতেরও রূপ আছে

অনিন্দ্য দে

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন ‘আঁধারেরও রূপ আছে’। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা হয়তো সেই রূপ অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু গণিতেরও যে রূপ আছে, সেকথা আমরা সবাই জানি কি? আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গণিত-শিল্পী এডমান্ড হ্যারিস সেই রূপকেই ফুটিয়ে তুলছেন তার ক্যানভাসে। গণিতের এই অধ্যাপকের নেশাই হল সচরাচর যেসব ক্ষেত্রে গণিত ব্যবহার করার ব্যাপারে আমাদের খুব একটা উৎসাহ থাকেনা, সেইসব জায়গায় গণিতকে কাজে লাগিয়ে নতুনতর উদ্ভাবন। গাণিতিক চিন্তা-ভাবনার সৌন্দর্য ও উপযোগিতাকে কীভাবে মানুষের কাছে তুলে আনা যায় সেই চেষ্টাতেই ছবি এঁকে চলেছেন এডমান্ড। আর সেই চেষ্টারই ফসল হল ‘ভিশন্‌স অফ নাম্বারল্যান্ড’ নামের একটি বই। বলা যেতে পারে অ্যালেক্স বেলোসকে সাথে নিয়ে হ্যারিস-এর গণিত-চিত্রের একটা প্রদর্শনী। তাহলে চলুন সেই প্রদর্শনী ঘুরে একবার দেখে নেওয়া যাক গণিতের রূপটা ঠিক কেমন?

মনে মনে যেকোন একটি সংখ্যা বেছে নিন। যদি এটা একটা জোড় সংখ্যা হয়, তাহলে তাকে অর্ধেক করুন। যদি সংখ্যাটা বিজোড় হয়, তাহলে তাকে তিনগুণ করে ঐ গুণফলের সাথে 1 যোগ করুন, তারপরে তাকে অর্ধেক করুন। এই ভাবে প্রক্রিয়াটা যদি আপনি পরপর চালিয়ে যেতে থাকেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি 1-এ পৌঁছাবেনই। ধরা যাক, আমরা 13 সংখ্যাটা নিয়ে শুরু করতে চাইছি। তাহলে তার তিনগুণ করে তার সাথে 1 যোগ করে তাকে অর্ধেক করলে পাব 20। এবারে তার অর্ধেক করে পাব 10, তার অর্ধেক করে পাব 5, সেখান থেকে পাব 8, 4, 2, 1। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমরা 1-এ পৌঁছে যাচ্ছি। আপনি একটা জোড় সংখ্যা নিয়ে শুরু করলেও সেই 1-এই পৌঁছবেন। ব্যাপারটা যে এরকম হবেই 1937 সালে সেটা প্রথম আমাদের দেখিয়েছিলেন জার্মান গণিতবিদ্ লোথার কোলাৎজ (1910–1990)। আর সেই থেকেই এর নাম হয়ে গেল “কোলৎজ কনজেকচার”। খুবই সাদামাটা একটা ধারণা; এতটাই সহজ-সরল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণিত ক্লাসেও দারুণ একটা খেলার বিষয় হয়ে উঠতে পারে এই কনজেকচার। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, গণিতের যেসমস্ত সমস্যার সমাধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, তাদের মধ্যে এই কনজেকচার অন্যতম। এটা ঠিক যে, এমন কোনও সংখ্যা পাওয়া যায় নি যারা কোলাৎজ-এর পদ্ধতি মেনে এগোতে এগোতে 1-এ পৌঁছাবে না; কিন্তু কেন যে সেটা হয় সেটা আমরা এখনও পর্যন্ত জানতে পারি নি। অর্থাৎ, এই কনজেকচারের কাঠামোটার, মানে তার কঙ্কালের, হদিশ আমরা এখনও পাইনি। কিন্তু তাই বলে তার বহিরঙ্গের রূপটা কেমন হবে সেটা আমরা জানতে পারব না, এমনতো কোনও কথা নেই।

চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক, কোলাৎজ কনজেকচার নিয়ে এডমান্ড হ্যারিস কী করলেন? প্রথমেই তিনি বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে কোলাৎজ-এর পদ্ধতি মেনে কীভাবে 2 পর্যন্ত পৌঁছানো যায় (এর পরেই আমরা 1–এ পৌঁছে যেতে পারব), তার একটা ছবি তৈরি করলেন। ছবিটা দেখলে মনে হয় যেন একটা বড় গাছ চারদিকে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রেখেছে (চিত্র 1)।

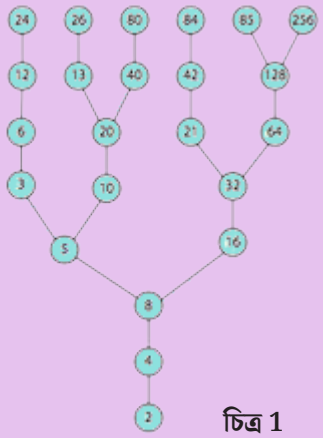

চিত্র 1

এবারে, কোলাৎজ-এর হিসেবনুযায়ী কোনও একটা সংখ্যা জোড় না বিজোড় হচ্ছে সেটা চোখে দেখেই বুঝে নেওয়ার জন্য এডমান্ড একটা নিয়ম তৈরি করলেন। আমরা 2 থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠব। যদি কোনও একটা সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যাটি জোড় হয়, তাহলে ঐ শাখাটিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে বাঁকিয়ে দেওয়া হবে। যদি পরবর্তী সংখ্যাটি বিজোড় হয় তাহলে শাখাটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বাঁকিয়ে দিতে হবে (চিত্র 2)।

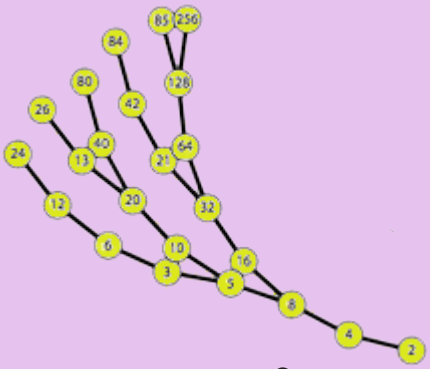

চিত্র 2

সবশেষে ছবির মধ্যে থেকে সংখ্যাগুলোকে তুলে দিতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা সামুদ্রিক শৈবালের চেহারা (চিত্র 3) আর সেই ছবিতে রঙ ঢেলেই কোলাৎজ কনজেকচারের চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুললেন এডমান্ড (চিত্র 4)।

এবারে নীচের ছবিটা ভালো করে দেখুন। ষড়ভুজ আকৃতির একটা অঞ্চলকে একইরকমের ছোট ছোট রম্বসের আকারের অনেকগুলো টালি দিয়ে ভর্তি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা টালি তিনটে সম্ভাব্য দিকের যেকোন একদিকে মুখ করে থাকতে পারে (চিত্র 5)। এভাবে টালি দিয়ে

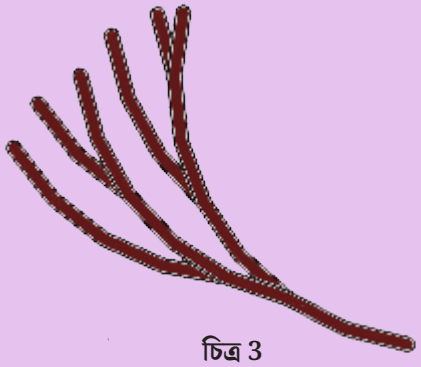
চিত্র 3

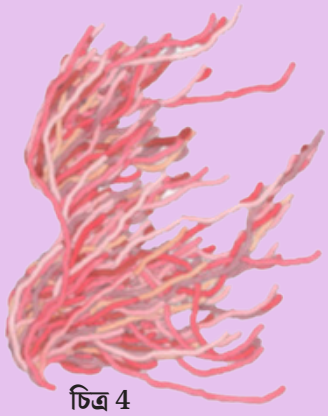

চিত্র 4

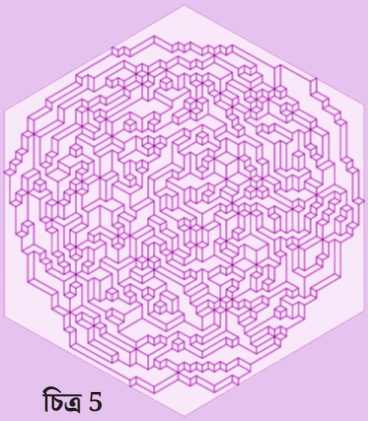

চিত্র 5

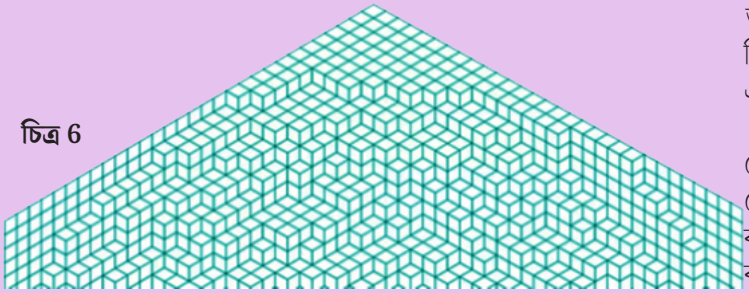

চিত্র 6

ষড়ভুজাকৃতির জায়গাটাকে নানারকমভাবেই ভর্তি করা যেতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে ধারের দিকে এসে সব টালিগুলোই একদিকে মুখ করে রয়েছে (চিত্র 6)। অর্থাৎ, ষড়ভুজ আকৃতিটাই যেন ধারের দিকের টালিগুলোকে এইরকম একটা বিন্যাস তৈরি করতে বাধ্য করছে। অথচ ষড়ভুজের মাঝখানে এইরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তার মানে ধারের দিকে এসে হঠাৎ করেই যেন একটা সুশৃঙ্খল বিন্যাস থেকে বিশৃঙ্খলা এসে পড়ছে। বরফ গলে যখন জল হয়, মানে কঠিন যখন তরলে পরিণত হয়, সেক্ষেত্রে হঠাৎ করে এই দশা পরিবর্তনের ঘটনাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করার একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। গণিতের অনুসারী চিত্রকর্ম প্রেরণা জোগাচ্ছে ভৌত বিশ্বের ব্যাখ্যায়।

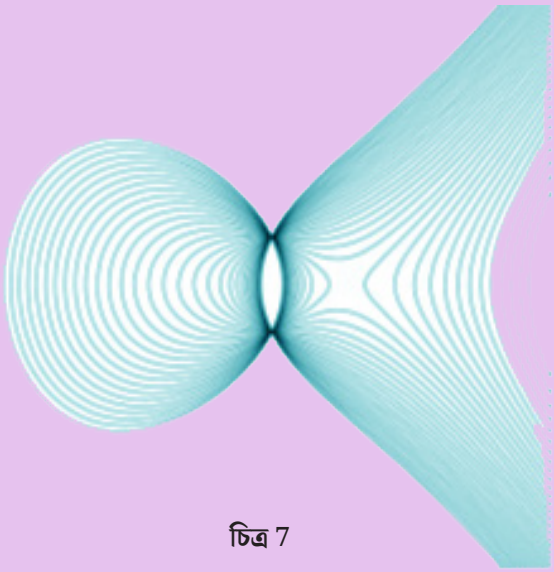

চিত্র 7

মারাত্মক প্লেগের হাত থেকে বাঁচতে শহর থেকে দূরে গ্রামে বসে ক্যালকুলাস নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে করতেই নিউটন খুঁজে পেয়েছিলেন কোনও বক্ররেখার (গণিতের কেতাবি ভাষায় যাকে কার্ভ বলে) নতি হিসেব করার রাস্তা। সেটা 1666 সাল। ঐ বছরে তিনি যেসব কাজকর্ম করেছিলেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ‘ট্র্যাক্ট অফ 1666’ নামের একটি নথিতে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ঐ সময়ে নিউটন $x^3 - abx + a^3 - cy^2 = 0$ (এখানে a, b আর c তিনটে ধ্রুবক) সমীকরণ থেকে যে বক্ররেখা পাওয়া যেতে পারে তার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। $a = 1$, $c = 4$ আর b-এর জন্য +8 থেকে শুরু করে –8 পর্যন্ত বিভিন্ন মান নিয়ে নিউটনের উদ্দিষ্ট সেই বক্ররেখার ছবিও এঁকে ফেলেছেন এডমান্ড (চিত্র 7)।

শেষ করব মজার একটা উপপাদ্যের কথা বলে। সেটা হল লোমশ বলের উপপাদ্য। এর মূল বক্তব্য হল: লোমশ একটা বলের উপর দিয়ে আপনি যত ভালো করেই চিরুনি চালান না কেন, বলের উপরের সমস্ত লোম কখনই শুয়ে পড়বে না; কমপক্ষে একটা লোম অন্তত দাঁড়িয়ে থাকবেই। এই উপপাদ্যেরই একটা বাস্তব প্রয়োগ হল—ভূপৃষ্ঠে সবসময়েই কম করে একটা জায়গা পাওয়া যাবেই যেখানে বায়ুপ্রবাহ নেই। আধুনিক গণিতে টপোলজি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চিত্র 8

কোনও বস্তুর আকৃতি পাল্টালেও তার যেসব বৈশিষ্ট্যের কোনও পরিবর্তন হয় না, সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর গাণিতিক চর্চাই হল টপোলজি। লোমশ বলের উপপাদ্য আসলে এই টপোলজিরই বিষয়। ঐ গোলকাকার লোমশ বলটাকে কিছুটা চেপ্টে দিয়ে যদি একটা রাগবি বলের চেহারায় নিয়ে আসা হয় বা তাকে টেনে-হিঁচড়ে একটা বাটির মতো চেহারায় নিয়ে আসা হয়, তাহলেও চিরুনী চালিয়ে সমস্ত লোম পেতে দেওয়া যাবে না। এডমান্ড-এর ছবিতে ফুটে উঠেছে সেই উপপাদ্যেরই মনোরম ছবি (চিত্র 8)। আশা করা যায়, হ্যারিস আর বেলোস-এর এই উদ্যোগ গণিতের ছাত্র আর চিত্রশিল্পী—দুদলকেই প্রেরণা জোগাবে। ●

*লেখক **শ্রী অনিন্দ্য দে** কলকাতা হিন্দু স্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক, বিজ্ঞান সঞ্চারক এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: anindya05@gmail.com*

ওলবার্সের ধাঁধা

অসিত চক্রবর্তী

পৃথিবী থেকে আকাশগঙ্গার দৃশ্য

দিনের বেলায় মেঘহীন আকাশকে আমরা সূর্যের আলোয় সর্বত্র আলোকিত দেখি, যদিও সময়ভেদে ও আকাশের অঞ্চলভেদে তার রঙ আলাদা হতে পারে। সূর্য নামক একটিমাত্র নক্ষত্রের প্রভাবে যদি তা'হয় তবে আমরা যে জ্যোতিষ্কের অন্তর্গত, অর্থাৎ আকাশগঙ্গা বা Milky Way, তাঁর প্রায় একশো বিলিয়ন (এক বিলিয়ন = একশো কোটি বা 10^9 সংখ্যক) নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের মেঘহীন রাতের আকাশও আলোয় উজ্জ্বল হওয়া উচিত। সব নক্ষত্রের কথা বাদ দিলেও এমনটা তো বলাই যায়। তাই না? বর্তমান হিসেব অনুযায়ী, ব্রহ্মাণ্ডে মোট জ্যোতিষ্কের সংখ্যা প্রায় দুই ট্রিলিয়ন (এক ট্রিলিয়ন = এক হাজার বিলিয়ন 10^{12} সংখ্যক)। এদের মধ্যে আমাদের বিশ্বে সূর্যের মত বা তার থেকেও বড় প্রায় দুশো বিলিয়ন ট্রিলিয়ন নক্ষত্র আছে। আসলে এই সংখ্যাটা এত প্রকান্ড যে আমাদের চোখ থেকে আকাশের যে কোন দিকে যতগুলি সরলরেখা টানা সম্ভব তার প্রতিটির শেষে রয়েছে অন্তত একটি নক্ষত্র। কিন্তু বাস্তবে রাতের মেঘহীন আকাশের দিকে তাকালে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য নক্ষত্র ব্যতীত সমস্ত আকাশকে অন্ধকার দেখি। তারা কি আলো দেয় না? কিংবা তারা কেন আকাশকে আলোকিত করে তোলে না? অর্থাৎ আলোর বড় বড় উৎস রয়েছে আকাশে কিন্তু রাতের বেলা আকাশ তবু অন্ধকার। কিন্তু কেন? এটাই ওলবার্সের ধাঁধা বা কূট (Olbers' paradox) নামে পরিচিত।

হেনরিখ উইলহেম ম্যাথিয়াস ওলবার্স (Henrich Wilhem Matthias Olbers; 1758–1840) জার্মানীর গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়লেও সাথে সাথে গণিত ও পদার্থবিদ্যাও অধ্যয়ন করেন। ডিগ্রি লাভের পরে তিনি চক্ষুবিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতে একটা ছোটোখাটো জ্যোতির্বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী তৈরী করেন এবং মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু ও পরিঘটনা লক্ষ্য করা শুরু করেন। অসময়ে তার স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর পরে তিনি কিছুটা নিজেকে গুটিয়ে নেন। সম্পূর্ণভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার জীবদ্দশায় তিনি দুটি গ্রহাণু (asteroid) ও পাঁচটি ধুমকেতু (comet) আবিষ্কার করেন। প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, ওলবার্সের প্রায় আড়াইশো বছর আগে এব্যাপারে বিজ্ঞান কুতুহলের পটভূমিতে প্রথম বিস্ময় প্রকাশ করেন ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ টমাস ডিগেস (Thomas Digges; 1546–1595) 1576 সালে। সত্যি বলতে কি, তিনিই প্রথম অ্যারিস্টটলের স্থির সসীম বহু সংখ্যক নক্ষত্রবিশিষ্ট গোলীয় বিশ্বের ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ লিপিবদ্ধ করেন। রাতের অন্ধকার আকাশ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বের বেশীরভাগ নক্ষত্র আমাদের দৃশ্যমান জগতের বাইরে আছে। সুতরাং সেখান থেকে কোন আলো আমাদের চোখে পৌঁছায় না। যদিও আজকের মতো এত সংখ্যক নক্ষত্রের কথা তখন অনুমানের বাইরে ছিল। 1610 সালে রাতের অন্ধকার আকাশের ব্যাখ্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার (Johannes Kepler; 1571–1630) সীমিত বিশ্বের যুক্তি আনলেন। সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাঁর নামাঙ্কিত তিনটি সূত্রের প্রবক্তা জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতায় সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের পরিসীমার বাইরে তিনি বেরোতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বের সৃষ্টি মানুষের জন্য।

কেপলার

হেনরিখ উইলহেম ম্যাথিয়াস ওলবার্স

এই ধাঁধা সমাধানে প্রথম গণিতের সাহায্য নেন 1744 সালে সুইস গণিতজ্ঞ ডি চেসেউস্ক (de Cheseaux; 1718–1751)। তাঁর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ঐ বছরেই তিনি প্রথম ছ'টি লেজবিশিষ্ট একটা ধুমকেতু আবিস্কার করেন ও তাঁর নাম অনুযায়ী পরবর্তীকালে ঐ ধুমকেতুর নামকরণ হয় Comet de Cheseaux বা চেসেউস্কের ধূমকেতু। যাই হোক, ফিরে আসা যাক আগের প্রসঙ্গে। চেসেউস্ক অঙ্ক কষে দেখালেন, কোন নক্ষত্র থেকে আগত আলোর প্রাবল্য দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতে কমে যায়, অর্থাৎ দূরত্ব দ্বিগুণ হলে প্রাবল্য হয়ে যায় চার ভাগের একভাগ। কিন্তু অন্যদিকে কাল্পনিক কোন

গোলাকার খোলকের (shell) তলে অবস্থিত নক্ষত্রের সংখ্যা দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। অতএব, কোন বিন্দুতে সমস্ত নক্ষত্র থেকে আগত আলোর প্রাবল্য যোগ করলে তার মোট প্রাবল্য একই থাকে।

তখনকার জানা কিছু তথ্য একত্রিত করে তিনি দেখালেন যে রাতের আকাশের উজ্জ্বলতা আমাদের একমাত্র সূর্যের তুলনায় প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার গুণ বেশি হওয়া উচিত। তবে কেন রাতের আকাশ অন্ধকার? উনি যুক্তি দিলেন, নক্ষত্রগুলির মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপস্থিত কোন শোষক মাধ্যম আলোর প্রাবল্য প্রায় শূন্য করে দিচ্ছে। এরপরে ওলবার্স এই কূট একটি গবেষণা পত্রে প্রকাশ করেন 7ই মে, 1823 তারিখে এবং এটা তাঁর নাম অনুযায়ী স্বীকৃত হয়। তিনিও এটার ব্যাখ্যায় আগে উদ্ধৃত চেসেউস্কের যুক্তি খাড়া করেন। ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কর্তা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেলের পুত্র এবং আর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ স্যার জন হার্শেল (John Herschel; 1792–1871) 1831 সালে এই যুক্তির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে কোন মাধ্যম নক্ষত্রের আলো ও তাপ শোষণ কোরলেও পরে, বিকিরণের নীতি অনুযায়ী, তা' নতুনভাবে উদ্গীরণ করে। সুতরাং মাধ্যমের শোষণ ওলবার্স ধাঁধার ব্যাখ্যা হতে পারে না। আশ্চর্যজনকভাবে কোন বিজ্ঞানী নন, কবি ও লেখক এডগার এলান পো (Edgar Allan Poe; 1809–1849) তাঁর ইউরেকা গ্রন্থে এই বিষয়ে প্রায় সঠিক চিন্তা তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, '.... একমাত্র উপায় .... (যার ফলে) আমরা (রাতের) আকাশের শূন্যতা (অন্ধকার) ব্যাখ্যা করতে পারি তা হলো এটা ধরে নেওয়া যে, অদৃশ্য পশ্চাদ্‌ভূমি এত প্রকান্ড যে এখান থেকে কোন আলো এখনো আমাদের চোখে আদৌ পৌঁছায়নি'।

আশ্চর্যজনকভাবে কোন বিজ্ঞানী নন, কবি ও লেখক এডগার এলান পো (Edgar Allan Poe; 1809–1849) তাঁর ইউরেকা গ্রন্থে এই বিষয়ে প্রায় সঠিক চিন্তা তুলে ধরেন।

কিন্তু মূল বিজ্ঞানের ধারার সঙ্গে যুক্ত ও বিজ্ঞান চর্চাকারী বা গবেষক না হওয়ার কারণে কেউ তখন অ্যালান পো'র বক্তব্যকে গুরুত্ব দেননি। 1901 সালে লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin; 1824–1907) বিস্তারিত গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন, মহাবিশ্ব এত প্রকান্ড যে বহু দূরের কোন নক্ষত্র থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগেই ঐ নক্ষত্রের আয়ু শেষ হয়ে যায় (এখন প্রমাণ হয়েছে যে সূর্যের মত নক্ষত্রের গড় আয়ু প্রায় একশো বিলিয়ন বছর)। কিন্তু এই যুক্তিও ওলবার্সের কূট সমাধানের ব্যাখ্যায় উপযোগী নয়।

মোদ্দা কথা হল, ঊনবিংশ শতকে রাতের অন্ধকার আকাশের সঠিক সর্বজনগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। বিংশ শতকের শুরুতে 1905 ও 1915 সালে আলবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতার মূল সমীকরণ অনুযায়ী বিশ্ব অস্থির হলেও স্থির বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর সনাতনী বিশ্বাস ও দর্শন হেতু ঐ সমীকরণে একটা ধ্রুবক যোগ করে তিনি স্থির বিশ্বের দেশ-কাল লেখচিত্র অঙ্কন করেন। রাশিয়ার স্বল্পায়ু বিজ্ঞানী ফ্রায়েডম্যান (Alexander Friedmann; 1888–1925) কিন্তু আইনস্টাইনের আগেকার মূল সমীকরণ সমাধান করেই ক্রমশ প্রসারণশীল বিশ্বের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে সহমত না হলেও পরে আইনস্টাইন অবশ্য পরে তা' মেনে নেন। 1929 সালে হাবল (Edwin Hubble; 1889–1953) ও হুমাসন (Milton Humason; 1891–1972) মাউন্ট উইলসন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের একশো ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপের সাহায্যে দূরবর্তী জ্যোতিষ্ক ও নক্ষত্রদের পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেন। অর্থাৎ, বিশ্ব সতত প্রসারণশীল। হাবল আরো লক্ষ্য করলেন যে এদের যেকোন দুটির পরস্পর থেকে সরে যাবার গতিবেগ ওদের মধ্যেকার দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক। যদি সত্যিই বিশ্ব প্রসারমান হয় তবে নিশ্চয়ই একটা সময় থেকে তার প্রসারণ শুরু; সেটাই হল বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্ত। এরপর 1965 সালে আমেরিকার বিখ্যাত বেল ল্যাবরেটরীতে আরনো অ্যালান পেঞ্জিয়াস (Arno Allan Penzias; 1933–) ও রবার্ট উডরো উইলসন (Robert Woodro Wilson; 1936–) সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা একটা মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণের (CMB বা Cosmic Microwave Background radiation) অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন। পেঞ্জিয়াস ও উইলসন তাদের গবেষণা কাজের জন্য 1978 সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল জয় করেন। কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণের সাথে তুলনা করে দেখা গেল, এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 2.72 কেলভিন ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 1.9 মিলিমিটার। প্রমাণ হল, CMB বিকিরণ বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্তে (বিগ ব্যাং) উদ্গীরিত বিকিরণ যা বিশ্বের তাপরুদ্ধ প্রসারণের ফলে ক্রমশ তাপ হারিয়ে বর্তমানে মাইক্রো তরঙ্গ আকারে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্তমান বিশ্বের প্রসারণগতি, CMB বিকিরণের অস্থিরতা (fluctuations) ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিবিধ লেখচিত্র সময়ের সাপেক্ষে অতীতে প্রসারিত করে দেখা গেল যে আমাদের মহাবিশ্বের জন্ম মোটামুটি 13.8 বিলিয়ন বছর আগে। CMB বিকিরণ হল বিগ ব্যাং এর ভয়াবহ বিস্ফোরণের স্মৃতিচিহ্ন। আরো দেখা গেল, স্বল্প সীমায় নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কগুলো ইতস্তত

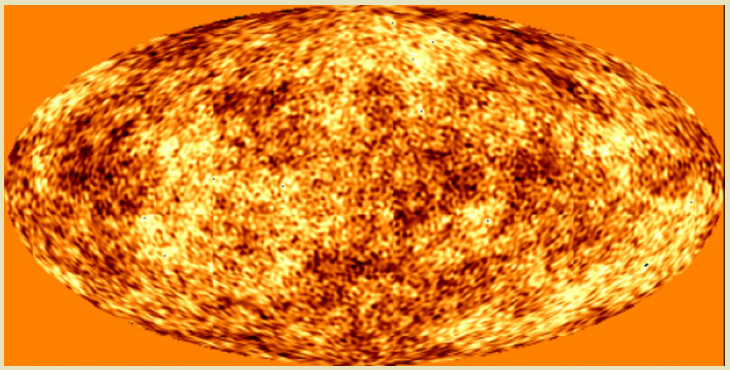

কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন

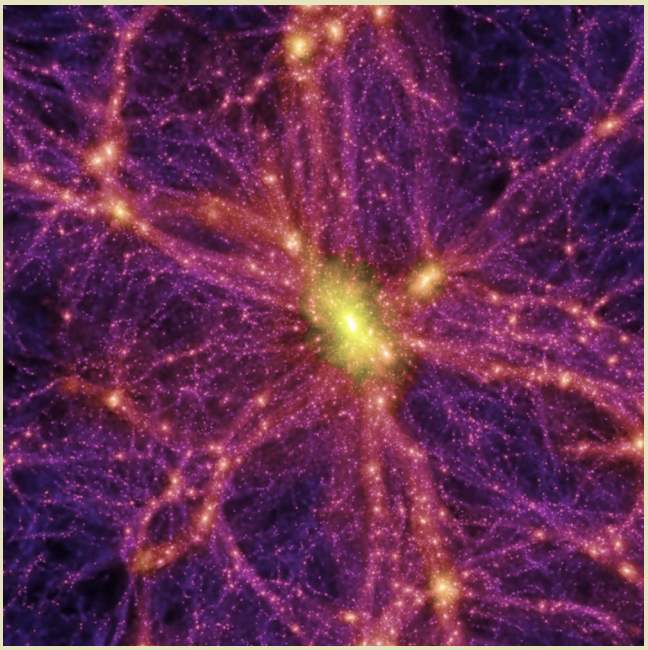

কৃষ্ণ বস্তু ও কৃষ্ণ শক্তি

বিক্ষিপ্ত হলেও মহাজাগতিক প্রকান্ড স্কেলে এগুলোর ঘনত্ব ও অন্যান্য ধর্ম সর্বত্র ও সর্বদিকে সমান। বর্তমানে আমাদের যে নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্কগুলোর আলো দেখতে পাওয়া সম্ভব তাদের থেকে আলো সর্বোচ্চ 13.8 বিলিয়ন বছর আগে নির্গত হয়েছিল। স্বভাবতই তাদের সর্বাধিক দূরত্ব হওয়া উচিত 13.8 আলোকবর্ষ। কিন্তু বিশ্বের প্রসারণশীলতার জন্য সেগুলোতো থেমে নেই। ভিন্ন ভিন্ন দূরের ঐ বস্তুগুলো ভিন্ন ভিন্ন গতিতে একে অপরের থেকে সরে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রসারণের হার প্রতি মেগাপারসেক দূরত্বের সীমায় (এক মেগাপারসেক = 3.26 মিলিয়ন আলোকবর্ষ) প্রায় 68 কিমি প্রতি সেকেন্ডে। এই হিসেবে 13.8 বিলিয়ন বছর আগেকার যে নক্ষত্রের আলো আমরা দেখছি, তার বর্তমান দূরত্ব আমাদের থেকে 46.5 বিলিয়ন আলোকবর্ষ।

এই কারণে আমাদের দৃশ্যমান জগতের আসল ব্যাস প্রায় 93 বিলিয়ন আলোকবর্ষ। আবার এই হিসেবে বর্তমানে যে নক্ষত্র আমাদের থেকে 14.4 বিলিয়ন আলোকবর্ষের বেশি দূরত্বে আছে তার গতিবেগ আলোর চেয়েও বেশি। সেখান থেকে আলো আমাদের চোখে পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনা নেই। এপ্রসঙ্গে একটা জরুরী প্রশ্ন চলে আসে। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী আমরা জানি, প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা শক্তির বেগ আলোর তুলনায় বেশি হতে পারেনা। তবে কীভাবে 14.4 আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্কের বেগ আলোর চেয়ে বেশি হয়? উত্তর হল, সর্বোচ্চ বেগের ঐ সীমা প্রযোজ্য হবে যদি স্থান (space) স্থির হয়। কিন্তু সেটা নিজেই যদি সৃষ্টি হতে হতে প্রসারিত হয় তবে ঐ সর্বোচ্চ সীমার অস্তিত্ব থাকে না। প্রসঙ্গক্রমে মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি অনুমান করতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা যদি একটা মহাকাশযানে আলোর সমান গতিবেগেও ছুটে যাই তাহলেও মোট দৃষ্টিগোচর ব্রহ্মান্ডের তিন শতাংশের বেশি দূরত্বে আমরা পৌঁছাতে পারব না।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম। বর্তমানে আমাদের দৃষ্টিগোচর বিশ্বের ব্যাসার্ধ 46.5 বিলিয়ন আলোকবর্ষ। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে জ্যোতিষ্ক, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ তেমনি রয়েছে কৃষ্ণ বস্তু (dark matter) ও কৃষ্ণ শক্তি (dark energy)। শেষোক্ত দুটি আমাদের চোখে অদৃশ্য। এদের উপস্থিতি জানতে পারি শুধুমাত্র গাণিতিক তথ্যের মাধ্যমে। আর এদের পরিমাণ বিশ্বর মোট বস্তুর পঁচানব্বই শতাংশ। মোটে পাঁচ শতাংশ হল সাধারণ বস্তু। আবার এর মধ্যে শুধুমাত্র ছ'শতাংশ হল আলোক উৎস। নক্ষত্রের মধ্যে অনেকেই মৃত (dying star) এবং কৃষ্ণ গহ্বর (black hole)। অর্থাৎ আলো দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কের পরিমাণ মোট বিশ্বব্রহ্মান্ডের মোট বস্তু ও আয়তনের তুলনায় নগণ্য।

আলো দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কের পরিমাণ মোট বিশ্বব্রহ্মান্ডের মোট বস্তু ও আয়তনের তুলনায় নগণ্য।

রাতের অন্ধকার আকাশের আরেকটি কারণও আছে, ডপলার ক্রিয়া। সাইরেন বা হুইশল লাগানো গাড়ি, যেমন অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। যখন সেই শব্দের উৎস ক্রমশ শ্রোতার কাছে এগিয়ে আসে, শব্দের কম্পাঙ্ক (সহজে বলতে গেলে তীক্ষ্ণতা) বাড়তে থাকে। আবার যে মুহূর্তে সেটা শ্রোতাকে অতিক্রম করে দূরে যেতে থাকে তার কম্পাঙ্ক কমতে থাকে। শব্দের ক্ষেত্রে যা হয়, আলো বা তাপ বিকিরণের ক্ষেত্রেও তাই হয়। মানে, কোন নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্ক ক্রমশ দূরে সরে গেলে তা'থেকে উৎপন্ন আলো তথা আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর কম্পাঙ্ক কমতে বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক নাম লাল স্থানান্তর বা red shift, আর এই পরিবর্তন তাদের বেগের বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। ধরে নেওয়া হল, একটা সময় কোন নক্ষত্র আমাদের চোখের উপযোগী দৃশ্যমান আলো (VIBGYOR) বিকিরণ করছে। নক্ষত্রের সরে যাবার বেগ বৃদ্ধির সাথে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দৃশ্যমান আলো পরপর অবলোহিত, মাইক্রো, রেডিও তরঙ্গের সীমায় প্রবেশ করবে। এগুলোর কোনটাই আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। নক্ষত্র থেকে সৃষ্ট দৃশ্যমান আলো তখন আমাদের চোখে অদৃশ্য হবে।

সুতরাং, রাতের অন্ধকার আকাশের কারণ দুটো। এক, বিশ্বের সসীম আয়ু ও তার ক্রমপ্রসারণ। দুই, বিকিরণ সম্পর্কিত ডপলার ক্রিয়া। বিস্তারিত গবেষণায় দেখা গেছে, ওলবার্সের ধাঁধা সমাধানে প্রথমটির ভূমিকা দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক বেশি। উল্টোদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, ওলবার্সের ধাঁধা ঐ দুই ঘটনার প্রমাণস্বরূপ। ●

লেখক ***ডঃ অসিত চক্রবর্তী*** *পদার্থবিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabarti.asit0@gmail.com

লক্ষ্যভেদী আইনস্টাইন

ভূপতি চক্রবর্তী

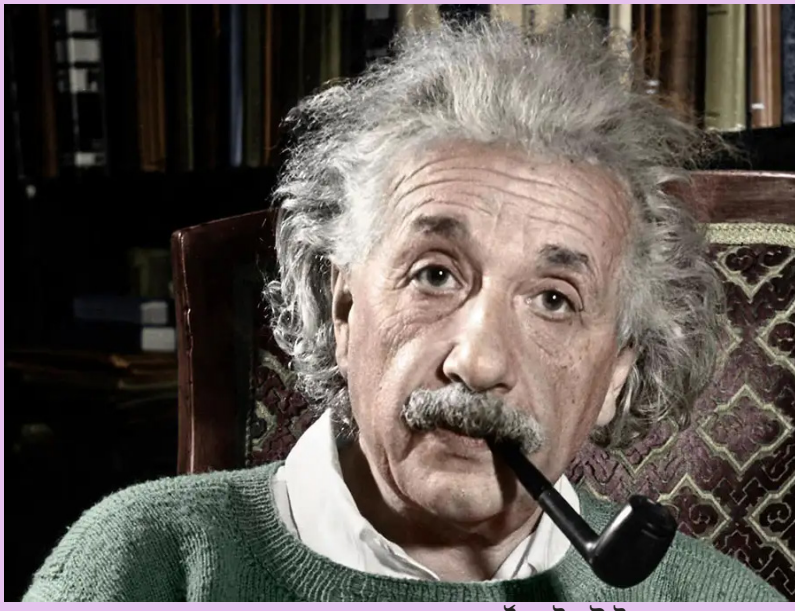

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

1918 সালের সেপ্টেম্বর মাস। বার্লিনের কার্ল উইলহেম ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একটি চিঠি পেলেন স্টকহোম থেকে। চিঠিটি এসেছে রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সচিবের কাছ থেকে। খামের ওপরে লেখা রয়েছে 'গোপনীয়' বা 'কনফিডেন্সিয়াল' যার অর্থ হচ্ছে যে ঐ চিঠির বিষয়টি প্রাপকের তরফ থেকে কাউকে জানানো যাবে না। পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কারের জন্য ওই অ্যাকাডেমির যে কমিটি রয়েছে সেই কমিটির তরফে আইনস্টাইনকে অনুরোধ করা হয়েছে 1919 সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরষ্কারের জন্য মনোনয়ন পাঠাতে। আর এই কাজে গোপনীয়তা বজায় রাখার কাজটি সবসময়ই জরুরী, কেবল সেই সময় নয়, আজও।

আইনস্টাইনের শরীর তখন একেবারেই ভালো যাচ্ছে না, কিছুটা কাজ করছেন কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছেন, তবু এই কাজটি তিনি খুব দ্রুত, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন। সেই সময় বিষয়টি অবশ্যই গোপনীয় থাকলেও এখন আমরা জানি যে, তিনি 1919 সালে এক জার্মান পদার্থবিদের নাম সেই বছরের জন্য অর্থাৎ 1919 সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরষ্কারের জন্য সুপারিশ করে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্টকহোমে। বস্তুত আইনস্টাইন সেই প্রথম নোবেল পুরষ্কারের জন্য সুপারিশ করলেন বা বলা যায় সেই তিনি প্রথম এই সুযোগ পেলেন। তার কারণ ওই 1919 সালেই তার কাছে স্টকহোম থেকে প্রথম অনুরোধ এলো পদার্থবিদ্যার নোবেলের জন্য মনোনয়ন পাঠানোর। লক্ষণীয় বিষয় যে আইনস্টাইনকে পরবর্তীকালে আর স্টকহোমের চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে হয় নি তিনি সরাসরিই পাঠিয়েছেন আরও কয়েকটি মনোনয়নপত্র বিভিন্ন সময়ে। সে কথায় আসবো এবার।

মনে রাখতে হবে, যে গত শতকের দ্বিতীয় দশকে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার জগতের এক অতি উজ্জ্বল নাম হলেও 1919 সালেও তার নোবেল অধরা। 1905 সালের বিস্ময় বর্ষে করা যে বিখ্যাত গবেষণা কাজগুলি পদার্থবিদ্যার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা বা আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব বা ভর-শক্তির সম্পর্ক সূচিত তার বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ এর উপস্থাপনা তাকে নোবেল প্রাপকের স্তরে উন্নীত করে নি। এমনকি 1915–16 সালের আপেক্ষিকতার সাধারণ সূত্রও স্টকহোম থেকে তার জন্য বহন করে আনেনি সেই বিখ্যাত পুরস্কারের সংবাদ। তাই পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের নোবেলের জন্য সুপারিশ পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি সেই অধিকার তখনও অর্জন করেন নি যা সেই সময় ওই বিষয়দুটির যে কোন একটিতে নোবেল জয়ের সঙ্গে সঙ্গে করায়ত্ব হত। তখনকার নিয়মানুযায়ী পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভুষিত হলে সেই বিজ্ঞানী পরবর্তীকালে ওই দুটি ক্ষেত্রের যে কোনটিতে তার বিচার বিবেচনা অনুযায়ী মনোনয়ন পাঠাতে পারতেন, তাদের প্রয়োজন হত না স্টকহোমের রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের থেকে আসা কোন অনুরোধপত্রের প্রতীক্ষার। এই প্রথা বা নিয়ম দীর্ঘদিন চালু ছিল সম্ভবত আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে পর্যন্ত কারণ তখনো পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা আর রসায়নকে প্রায় এক-পরিবারের সদস্য ধরা হত। অন্যথায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রথম সারির কিছু অধ্যাপকের মতই যদি আইনস্টাইনের কাছে রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স থেকে সেই সংক্রান্ত কোন অনুরোধপত্র এসে পৌঁছতো তবেই তিনি মনোনয়ন পাঠাতে পারতেন। 1919 সালে আইনস্টাইন ছিলেন এই অধ্যাপকগোষ্ঠীর

একজন, যারা ছড়িয়ে ছিলেন বিশ্বের নানা দেশে। অনেক পরে রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স সেই নিয়মে কিছুটা পরিবর্তন আনে। তার ফলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নোবেলজয়ীরা দুটিতেই নন, কেবল তাদের নির্দিষ্ট বিভাগেই মনোনয়নপত্র পাঠাতে পারবেন বলে স্থির হয়।

কার নাম আইনস্টাইন সুপারিশ করেছিলেন? এই প্রশ্নটা অবশ্য আমাদের একটু ভিন্ন ভাবে করা উচিত, বলা উচিত কার কার নামে তিনি মনোনয়ন পাঠিয়েছিলেন? নোবেল পুরস্কার গোড়া থেকেই তিনজন পর্যন্ত জীবিত বিজ্ঞানীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই কেউ সুপারিশপত্র পাঠানোর সময়ে সেখানে সেই ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ তিনজন পর্যন্ত বিজ্ঞানীর নাম সুপারিশ করতে পারেন। আর তাছাড়া যারা একাধিক বছরে নোবেলের জন্য নাম সুপারিশ করার সুযোগ পেয়েছেন তাদের স্বাধীনতা রয়েছে একই বিজ্ঞানীর নাম বার বার সুপারিশ করার, যদি না তিনি আগের সুপারিশের ভিত্তিতে পুরস্কার জয় করে থাকেন। অনেকে বিষয়টিকে একটি বিশেষ নামের পক্ষে এক ধরণের প্রচার ক্যাম্পেন হিসেবে দেখেছেন, এবং সেই চিন্তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এমনটা বলা যাবে না। তবে 1919 সালে আইনস্টাইন মনোনয়নপত্র পাঠিয়েছিলেন তিন বা দুই জন নয়, মাত্র একজন পদার্থবিদের নামেই, তিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক।

আসলে 1918 সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষণা করা যায়নি, তা স্থগিত রাখা হয়েছিল। সেই সময় ইওরোপের বেশ কিছু অংশে এবং তার বাইরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে পরিস্থিতি একেবারেই স্বভাবিক ছিল না। বিজ্ঞানচর্চার অভিমুখ বদলে গিয়েছিল, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে কাজে আসবে এমন ধরণের গবেষণাকাজ জার্মানি বা তার প্রতিপক্ষ দেশ যেমন গ্রেট ব্রিটেনের অনেক বিজ্ঞানীকেই শুরু করতে হয়েছিল। চিঠিপত্র ঠিকভাবে পৌঁছনোর বিষয়টিও ছিল বেশ অনিশ্চিত। যুদ্ধের ফলে বেশ অনেকগুলি দেশ তখন যুধুমান শিবিরে বিভক্ত, হয়ত বা বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত সম্পর্কেও লেগেছে তার কিছুটা ছোঁয়াচ। তাই 1918 সালে কেবল পদার্থবিদ্যার নয়; দেওয়া হল না রসায়ন এবং শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারও। তবে প্রথম দুটি শাখার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা গেল শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের নোবেলের ঘোষণার ব্যাপারে। শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জানিয়ে দেওয়া হল ওই বছর পুরস্কার দেওয়াই হচ্ছে না। আলফ্রেড নোবেলের উইল বা ইচ্ছাপত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই পুরস্কার সম্পর্কিত নিয়মাবলী অনুযায়ী সেই বছরের শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুরস্কারের জন্য চিহ্নিত অর্থ চলে যাবে নোবেল কমিটির এক বিশেষ ফান্ডে যা পরবর্তীকালে পুরস্কার সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ সেই পুরস্কার স্থগিত নয়, সেই বছরের জন্য পরিত্যক্ত হলো। এখনকার সীমিত ওভারের ক্রিকেট ম্যাচে বৃষ্টি হলে যেমন ম্যাচ কখনও স্থগিত হয়ে যায় কিছু সময়ের জন্য, আর প্রবল বৃষ্টির ক্ষেত্রে তা হয় পরিত্যক্ত, ব্যাপারটা কিছুটা সেইরকম। অন্যদিকে 1918 সালের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের জন্য পুরস্কার দুটি কিন্তু জিইয়ে রাখা হল, তারা রয়ে গেল স্থগিত। তাই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হল যে পুরস্কার সেই বছর (1918) স্থগিত রাখা হচ্ছে কারণ "উপযুক্ত স্তরের মনোনয়ন পাওয়া যায় নি"।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হল যে পুরস্কার সেই বছর (1918) স্থগিত রাখা হচ্ছে কারণ "উপযুক্ত স্তরের মনোনয়ন পাওয়া যায় নি"

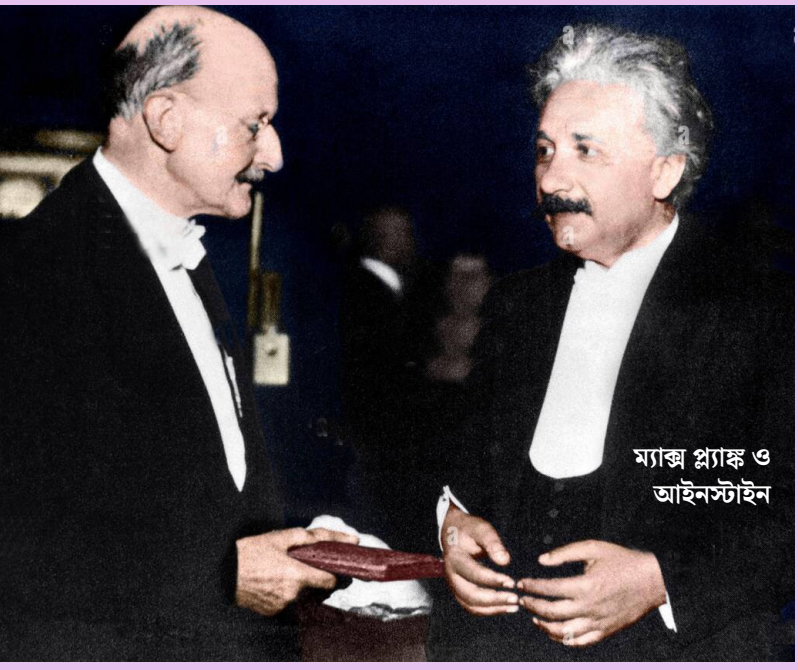
ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইন

সুইডিশ রয়েল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স থেকে ঘোষিত এই বিবৃতিটি কতটা ঠিক? বস্তুত আমরা এখন নোবেল পুরস্কারের আর্কাইভ থেকে যে তথ্য পাচ্ছি সেখান থেকে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিজ্ঞানীমহলে যে মানসিকতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তা এই পুরস্কার ঘোষণার জন্য খুব অনুকূল নয় বলে স্টকহোমের অ্যাকাডেমি ও তার অধীনস্থ কমিটিগুলি মনে করেছিল। এখানেও নোবেল কমিটি সর্বদাই বিতর্ক এড়াতে চেয়ে এসেছে তাই তাদের ঘোষণায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই, পুরস্কার স্থগিতের ঘোষণায় যুদ্ধের কারণ এড়িয়ে ভিন্ন যুক্তি দেওয়া হল। আর এই যুক্তি কতটা অসার ছিল তা টের পাওয়া গেল পরের বছর 1919 সালেই।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের 1918 সালের নোবেলের জন্য বৈধ মনোনয়ন কিন্তু নেহাত কম আসে নি, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায়। পদার্থবিদ্যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা পড়েছিল 29 টি মনোনয়ন, যা তার আগের কয়েক বছরের তুলনায় মোটেই কম ছিল না। যেহেতু একাধিক বিজ্ঞানী কেবল একজনের নয় দুই বা এমনকি তিনজনের নাম পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন তাই মনোনীত পদার্থবিদের সংখ্যা 29 থেকে

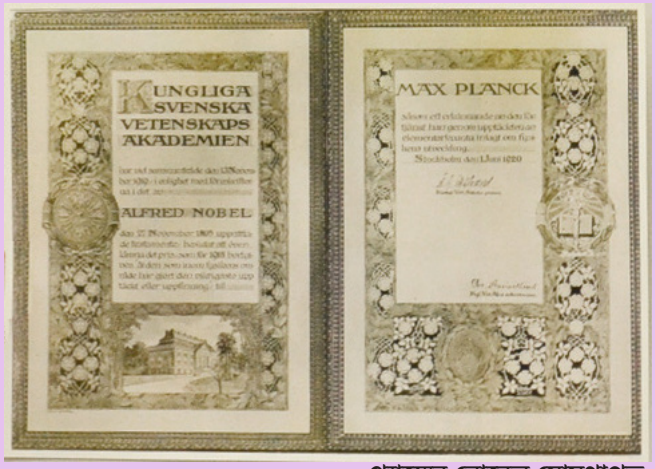

প্ল্যাঙ্কের নোবেল ঘোষণাপত্র

বেশি হতে পারত। কিন্তু অনেকেই আবার একই বিজ্ঞানীর নাম পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা গেল যে মোট 18 জন বিজ্ঞানীর নামে মনোনয়ন এসেছে। যেমন আইনস্টাইন পেয়েছিলেন মোট 6 টি মনোনয়ন এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কও পেয়েছিলেন মোট 6 টি মনোনয়ন, ফরাসী পদার্থবিদ জাঁ পেরিন 3 টি এবং মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিকান, ডাচ পদার্থবিদ হেনরিক লরেনৎজ, এবং আরও দুই বিজ্ঞনী চার্লস পেরি ও ল্লাদিমির পলসন প্রত্যেকেই পেয়েছিলেন দুটি করে মনোনয়ন। ফলে মোট 18 জন ভিন্ন বিজ্ঞানী এক বা একাধিক মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

সেই সময়টা মাথায় রাখলে এই তালিকাটি মোটেই ছোট বলা যাবে না, কারণ দেখা যাচ্ছে ঠিক তার আগের বছর 1917 সালে এসেছিল মোট 34 টি মনোনয়ন আর 1919 সালের পদার্থবিদ্যার পুরস্কারের জন্য জমা পড়েছিল 30 টি মনোনয়ন এবং এই তালিকায় থাকা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ককে 1919 সালে নোবেল পুরস্কারে যখন ভূষিত করা হয়, তখন উল্লেখ করা হয় যে সেটি হচ্ছে 1918 এর পদার্থবিদ্যার নোবেল। এদিকে সেই রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের অধীনস্থ পদার্থবিদ্যার নোবেল কমিটি 1918 সালে জানিয়ে দিয়েছিল যে পুরস্কারের উপযুক্ত পদার্থবিদকে তারা খুঁজে পাননি। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে 1918 তে যেখানে প্ল্যাঙ্কের জন্য 6 টি মনোনয়ন পাওয়া গিয়েছিল তখন তাকে পুরস্কার না দিয়ে, পরোক্ষভাবে 'অনুপযুক্ত' আখ্যা দেওয়া হল। আবার 1919 এসে সেই একই বিজ্ঞানীকে কীভাবে 1918 এর পুরস্কার দেওয়া হল? বিশেষ করে প্ল্যাঙ্কের নোবেল সম্ভবত আরও বেশ কিছুটা আগেই দেওয়া উচিত ছিল কারণ 1900 সালে উপস্থাপিত সেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব 1905 সালে আইনস্টাইন অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য। তারপর 1913 সালে নীলস বোর সেই তত্ত্ব প্রয়োগ করলেন হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠনের ব্যাখ্যায়। দুটি ক্ষেত্রেই যে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলি বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল এই তত্ত্ব সেগুলি চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বোর এবং আইনস্টাইনের এই বিখ্যাত কাজ দুটির মূলে ছিল প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এই গবেষণাকাজের বিষয়ে এখন বিদ্যালয়স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারে, বুঝতে পারে কতটা মৌলিক এই গবেষণাগুলি।

বস্তুত প্ল্যাঙ্কের নোবেল ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হল যে তিনি এই পুরস্কার পাচ্ছেন "in recognition of the services he rendered to the advancement of Physics by his discovery of energy quanta" (শক্তির কোয়ান্টা আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে পদার্থবিদ্যার অগ্রগতিতে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন তার স্বীকৃতি হিসেব)।

একই ঘটনা লক্ষ করা গেল ঐ 1918 সালের রসায়নের নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারে। সরকারিভাবে এখানেও জানানো হয়েছিল যে উপযুক্ত বিজ্ঞানীকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়ায় 1918 সালের নোবেল পুরস্কার স্থগিত রাখা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে যুক্তিতে হয়ত খানিকটা জোর ছিল। কারণ রসায়নের 1918 এর জন্য নোবেলের মনোনয়ন এসেছিল মাত্র 11 টি, যদিও 1917 সালে আসা 17 টি মনোনয়নপত্রের তুলনায় এই সংখ্যা সাংঘাতিক কম নয়। বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে 1918 তে মনোনয়ন পেয়েছিলেন 9 জন রসায়নবিদ, যেখানে 1917 তে মনোনীত বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল 10। খুব তফাৎ রয়েছে কি? তবে 1916 সালে রসায়নের জন্য এসেছিল 27 টি মনোনয়ন, আর এখানেও ফ্রিৎজ হেবারের জন্য এসেছিল 3 টি মনোনয়ন। আসলে রসায়নের নোবেল নিয়ে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সমস্যা ছিল গভীরতর। কিন্তু 1916 এবং 1917 এর রসায়নের নোবেল তারা ঘোষণা করতে পারেন নি, বস্তুত সেই দুটি বছরের জন্য রসায়নের নোবেল দেওয়াই যায় নি এবং তা স্থগিতও রাখা হয়নি, একেবারেই তা পরিত্যক্ত হয়েছে। সরকারিভাবে মেনে নিতে হয়েছে যে ঐ দুটি বছর রসায়নের নোবেল কেউই পাবেন না। সন্দেহ নেই এর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে সেই সময় চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেখানে রসায়ন এবং রসায়নবিদদের রয়েছে এক গভীর ভূমিকা। তাই 1918 তে রসায়নের নোবেল ঘোষণার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল স্টকহোমের। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে জার্মান রসায়নবিদ ফ্রিৎজ হেবারকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স ছিল দ্বিধাগ্রস্থ, কারণ শোনা যাচ্ছিল যে হেবারের গবেষণা অ্যামোনিয়া সশ্লেষনের পথ ছেড়ে এগিয়ে চলেছে বিষাক্ত গ্যাস উদ্ভাবনার কাজে। আর তাছাড়া তিনি তো 1916, 1917 এবং 1918 তেও মনোনীত হয়েছেন এবং কোন বছরেই

রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস

ফ্রিৎজ হেবার

তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি। রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স তাই 1918 সালের পুরস্কার স্থগিত রেখে চেষ্টা করল যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বোঝার। হেবারকে পুরস্কার প্রায় দিতেই হয়, আবার তারই গবেষণাকাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি গ্যাস যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের সেনাদের ওপর প্রয়োগ করে শুরু করে দেওয়া যাবে রাসায়নিক যুদ্ধ। সে ছিল এক সত্যিকারের সিদ্ধান্ত-সঙ্কট। 1918 র সেই সময় রসায়নের নোবেলের জন্য অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক মনোনয়নের আর একটি কারণ সম্ভবত সেই সময়কার বিজ্ঞানী মহলের আকার বা সাইজ। ইওরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন পদার্থবিদ্যার গবেষণায় বিশেষ জোয়ার এসেছে পদার্থবিদ মহল তুলনায় আকারে বেশ খানিকটা বড়, সেখানে মনোনয়ন পাঠানোর উপযুক্ত বিজ্ঞানীর সংখ্যাও অনেকটাই বেশি।

1918 এর স্থগিত হয়ে যাওয়া পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নোবেল ঘোষিত হল 1919 সালে। আর তখনই দেখা গেল একটি অদ্ভুত ঘটনা। এবার কিন্তু 1919 সালের রসায়নের নোবেল ঘোষিত তো হলই না বরং 1918 এর শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মত দশা হল 1919 এর রসায়নের। কাউকে দেওয়া হল না পুরস্কার এবং সেই 1919 এর পুরস্কার স্থগিত নয় একেবারে বাতিল করে দেওয়া হল, পুরস্কারের অর্থ আবার চলে গেল সেই বিশেষ ফান্ডে। 1919 এর পদার্থবিদ্যার নোবেল অবশ্য একই সঙ্গে ঘোষিত হল এবং পেলেন আর এক জার্মান বিজ্ঞানী জোহাননস স্টার্ক। এর অর্থ হচ্ছে 1916 থেকে 1919 সাল পর্যন্ত চার বছরে মাত্র একজনকে দেওয়া হল রসায়নের এই গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারটি। অন্যদিকে দেখা গেল 1918 এর পুরস্কার পাচ্ছেন দু জার্মান বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ্যায় পাচ্ছেন কোয়ান্টম তত্ত্বের জন্য ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও রসায়নে "অ্যামোনিয়াকে তার মূল মৌলদুটি থেকে সংশ্লেষন" করার কাজে সাফল্যের জন্য ফ্রিৎজ হেবার।

1919 সালের রসায়নের নোবেল ঘোষিত তো হলই না বরং 1918 এর শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মত দশা হল 1919 এর রসায়নের।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে 1919 সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক পেলেন 5 টি মনোনয়ন, যার মধ্যে একটি ছিল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পাঠানো। কিন্তু 1919 সালে আইনস্টাইনের জন্যও জমা পড়েছিল 5 টি মনোনয়ন। তবে এরা কেউই সেই বছর সর্বোচ্চ সংখ্যক মনোনয়ন পাননি। সেই কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন মার্কিন পদার্থবিদ রবার্ট মিলিকান যিনি পেয়েছিলেন 6 টি মনোনয়ন। আমরা এখন জানি যে আইনস্টাইন 1921 এর পদার্থবিদ্যার নোবেল পেয়েছিলেন আর 1923-এ একই বিভাগে নোবেল পান রবার্ট মিলিকান। আর মাঝের বছর 1922 এ পদার্থবিদ্যার নোবেল জয় করেন নীলস বোর।

1921 এর পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাপ্তির পরে আইনস্টাইন সেই বিশেষ অধিকার অর্জন করলেন। যেহেতু এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল 1922 সালে তাই বলা যায় 1922 সালে থেকে আইনস্টাইন সেই বিশেষ বিজ্ঞানীগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত হলেন যারা তাদের বিবেচনা অনুযায়ী পদার্থবিদ্যা আর রসায়নের নোবেলের

ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ

আরউইন শ্রোয়ডিঙ্গার

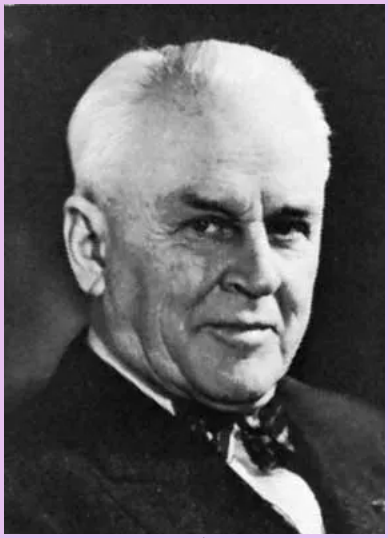
রবার্ট মিলিকান

নীলস বোর

জন্য সুপারিশপত্র পাঠাতে পারবেন, অপেক্ষা করতে হবে না স্টকহোম থেকে আসা অনুরোধপত্রের জন্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে আইনস্টাইনকে পদার্থবিদ্যার নোবেলের জন্য প্রথম মনোনয়ন কোন পদার্থবিদ বা গণিতবিদ করেন নি। তার প্রথম মনোনয়নপত্র গিয়েছিল এক রসায়নবিদের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন 1909 সালের রসায়নে নোবেলজয়ী জার্মানির উইলহেলম অস্টওয়াল্ড। তার পরের বছর 1910 সালে অস্টওয়াল্ড আইনস্টাইনকে মনোনীত করেন কারণ সেই সময় রসায়নের একজন নোবেলজয়ী হওয়ায় তিনি পদার্থবিদ্যার নোবেলের সুপারিশ করার অধিকারী হন এবং নোবেল পুরস্কারের আর্কাইভ বা লেখ্যাগার থেকে দেখা যাচ্ছে যে 1910 সালেই অস্টওয়াল্ড তার সেই অধিকার প্রথম প্রয়োগ করলেন এবং সকলের আগে আইনস্টাইনকে মনোনয়ন দিলেন।

আইনস্টাইনকে পদার্থবিদ্যার নোবেলের জন্য প্রথম মনোনয়ন কোন পদার্থবিদ বা গণিতবিদ করেন নি। তার প্রথম মনোনয়নপত্র গিয়েছিল এক রসায়নবিদের কাছ থেকে।

1922 সালে ঘোষিত 1921 সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল জয় করার পরে আইনস্টাইন মনোনয়নের ব্যাপারে যে বিশেষ অধিকার পেলেন তার প্রথম প্রয়োগ তিনি করলেন 1924-এ। এবার তিনি পদার্থবিদ্যার নোবেলের জন্য পাঠালেন দু'জন জার্মান পদার্থবিদের নাম। তারা জেমস ফ্রাঙ্ক ও গুস্তাভ হার্ৎজ। পদার্থবিদ্যার ছাত্ররা সকলেই বিখ্যাত 'ফ্রাঙ্ক অ্যান্ড হার্ৎজ এক্সপেরিমেন্ট' এর বিষয়ে জানেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রনের বিভিন্ন শক্তিস্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সেই দিক থেকে এটি একটি দিকদর্শী পরীক্ষা। ঠিক এক বছর পরে এই দুই পদার্থবিদ 1925 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল ভাগ করে নেন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আইনস্টাইনকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হিসেবে আমরা সকলেই জানি। অথচ তার অর্ন্তদৃষ্টি কতটা গভীর এখানে তার একটি প্রমাণ মেলে। তিনি এমন দু'জন বিজ্ঞানীর নাম সুপারিশ করছেন যারা পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিদ্যার গবেষণার সঙ্গে যুক্ত এবং গবেষণাগারে একটি বিশেষ সুপরিকল্পিত পরীক্ষার মাধ্যমে তারা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করছেন এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপরে।

আইনস্টাইনের নোবেল ঘোষণাপত্র

ঠিক একইভাবে আইনস্টাইন 1926 সালে সুপারিশ করলেন মার্কিন পদার্থবিদ আর্থার কম্পটনের নাম। কম্পটনও একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব এবং পারমাণবিক গঠন সংক্রান্ত তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন এক জোরালো ভিত্তিভূমির ওপরে। কম্পটন নোবেল জয় করলেন 1927 সালে, এককভাবে। দেখা যাচ্ছে যে আইনস্টাইন তাত্ত্বিক ও পরীক্ষাভিত্তিক পদার্থবিদ্যায় গবেষণারত উভয় বিভাগের বিজ্ঞানীদের গবেষণাকাজের দিকে সমানভাবে লক্ষ রেখেছেন এবং নোবেলের জন্য মনোনয়ন পাঠিয়েছেন। 1932 সালে তিনি মনোনীত করলেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ও আরউইন শ্রোয়ডিঙ্গারকে। হাইজেনবার্গ ঐ 1932 সালেই নোবেল জয় করলেন, কিন্তু এককভাবে। বাদ থেকে গেলেন শ্রোয়ডিঙ্গার। তিনি নোবেল পেলেন তার পরের বছর 1933 সালে এবং তার সাথে এই নোবেল ভাগ করে নিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আর এক দিকপাল ব্রিটিশ পদার্থবিদ পল ডিরাক। শ্রোয়ডিঙ্গার 1932 এর পুরস্কার না পাওয়ায় আইনস্টাইন হয়ত বা কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন। 1933 সালে সেই শ্রোয়ডিঙ্গারকে আবার মনোনীত করলেন। তিনি কেবল শ্রোয়ডিঙ্গারের জন্য দু'বার মনোনয়ন পাঠিয়েছেন। আসলে আইনস্টাইনের

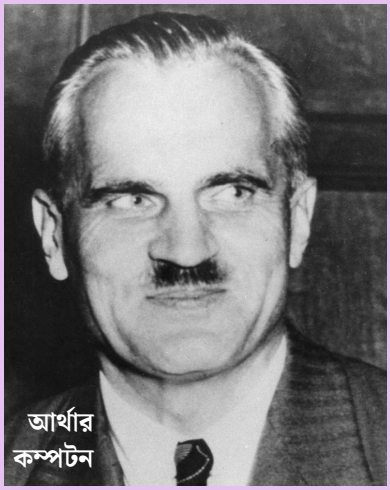
আর্থার কম্পটন

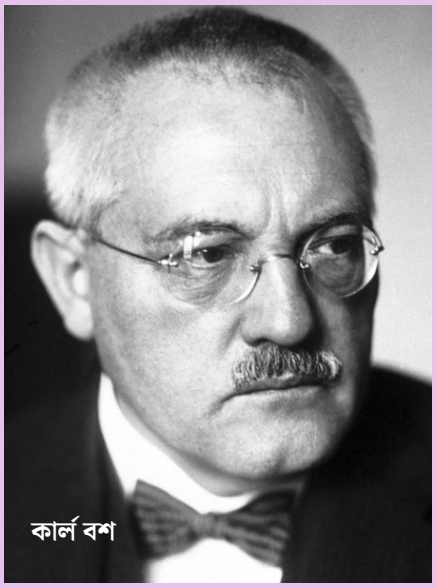
কার্ল বশ

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল দর্শন নিয়ে কিছু আপত্তি ছিল আমরা জানি। কিন্তু এই নতুন বিষয়টির মূল কারিগরদের প্রতি তার ছিল গভীর আস্থা। হলেনই বা তারা বয়সে তার থেকে বেশ খানিকটা ছোট, আইনস্টাইনের গভীর আস্থা ছিল তাদের প্রজ্ঞায়। তাই তার সুপারিশে হাইজেনবার্গ 1932 এর পুরস্কার এককভাবে জয় করলেও তার মনে হয়েছিল যে শ্রোয়ডিঙ্গার এই পুরস্কারের জন্য অতি যোগ্য এক বিজ্ঞানী। আর সেজন্যই শ্রোয়ডিঙ্গার এর জন্য আবারও পাঠালেন এল মনোনয়নপত্র। এবারে তিনি লক্ষ্যভেদে সক্ষম হলেন। 1933 এর পদার্থবিদ্যার নোবেলের অংশীদার হলেন অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী আরউইন শ্রোয়ডিঙ্গার।

1932 সালের একেবারে শেষে আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে চলে আসেন। আর কখনই তিনি জার্মানিতে পা রাখেন নি। খুব ঠিক করে বলতে গেলে হিটলার তখনও জার্মানিতে ক্ষমতাসীন হননি, কিন্তু তার এবং তার দলের ক্ষমতাভিমুখী পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। স্বল্প সময় ইংল্যান্ডে কাটিয়ে আইনস্টাইন চলে আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1933 এর গোড়ার দিকে। শ্রোয়ডিঙ্গারের মনোনয়নই সম্ভবত তিনি শেষ পাঠিয়েছিলেন জার্মানি থেকে। তবে তার আগে তিনি একটিমাত্র রসায়নের মনোনয়ন পাঠিয়েছিলেন জার্মান রসায়নবিদ কার্ল বশের জন্য। বিখ্যাত এক শিল্পপতি পরিবারের সদস্য কার্ল বশ ছিলেন আইনস্টাইনের বন্ধুস্থানীয় এবং পরবর্তী কালে নাজী জার্মানির ঘোরতর বিরোধী। 1931 সালে কার্ল বশ রসায়নের নোবেল জয় করেন।

ইসাডোর রাবি

আইনস্টাইনের পরবর্তী পর্যায়ে নোবেলের জন্য কয়েকটি মনোনয়ন পাঠিয়েছেন আমেরিকা থেকে। তবে কয়েকটা বছর পর থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আইনস্টাইন 1940 সালে অটো স্টার্ন ও ইসাডোর রাবিকে পদার্থবিদ্যার নোবেলের জন্য একই সঙ্গে মনোনীত করছেন। ইসাডোর রাবি মার্কিন পদার্থবিদ যিনি যার মৌলিক গবেষণা আমাদের হাতে পরবর্তীকালে তুলে দিয়েছে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে ম্যাগনেটিক রেসন্যান্স ইমেজিং বা এম আর আই (MRI) এর মত অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। অটো স্টার্ন জন্মসূত্রে জার্মান এবং তার পেশাগত জীবনের বেশ অনেকটাই কেটেছে জার্মানিতে, তবে পরবর্তীকালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন এবং গবেষণাকাজ করেন। জার্মানিতে তিনি 1922 সালে তার সহকর্মী ওয়ালদ্যার গারল্যাখের সঙ্গে একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে ইলেকট্রনের স্পিনের একটি মৌলিক ধর্মের প্রমাণ পেয়েছেন, তাত্ত্বিক ভাবে যা ভাবা হয়েছিল তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টার্ন 1943 সালে এবং রাবি 1944 সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পেয়েছেন, এবং দুজনেই তা পেয়েছেন এককভাবে। মনে রাখতে হবে যে আইনস্টাইন যখন 1940 সালে মনোনয়নদুটি পাঠিয়েছিলেন তখন ইওরোপে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পদার্থবিদ্যার নোবেল দেওয়া গেল না, পর পর তিন বছর, প্রকৃতপক্ষে স্থগিত নয় একেবারেই বাতিল হল 1940, 1941, 1942 এর পদার্থবিদ্যার নোবেল। যুদ্ধের কারণে এই পুরস্কার সংক্রান্ত কাজগুলি চালানো একেবারেই সম্ভব ছিল না। তার পরের দু বছরে কিন্তু দেখা গেল যে পর পর আইনস্টাইন মনোনীত দুই বিজ্ঞানী স্টার্ন 1943 সালে এবং রাবি 1944 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয় করলেন। কেবল তাই নয় উভয় ক্ষেত্রেই এই দুই বিজ্ঞানী জয়ী হয়েছেন এককভাবে, পুরস্কার তাদের ভাগ করে নিতে হয় নি।

উলফগ্যাং পাউলি

1932 সালের একেবারে শেষে আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে চলে আসেন। আর কখনই তিনি জার্মানিতে পা রাখেন নি।

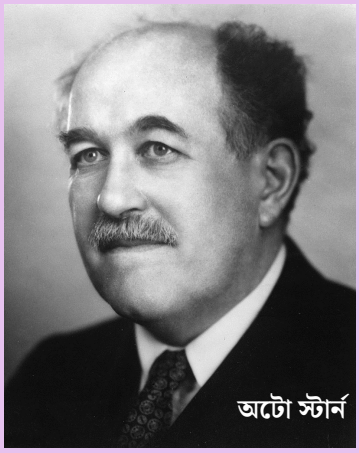
অটো স্টার্ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে আইনস্টাইন 1945 সালে, মনোনীত করলেন উলফগ্যাং পাউলিকে। জন্মসূত্রে অস্ট্রিয়ার এই তাত্ত্বিক পদার্থবিদ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম স্থপতি এবং আমাদের দিয়েছেন একটি বিখ্যাত নীতি, 'পাউলির বর্জন নীতি'। অবশ্য তার গবেষণা বিষয়ক কাজের অনেকটাই হয়েছে জার্মানিতে। তবে 1945 সালে তিনি মার্কিন নাগরিক এবং যুক্ত রয়েছেন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। দেখা গেল, 1945 সালে এককভাবে পদার্থবিদ্যার নোবেল পেলেন উলফগ্যাং পাউলি। আইনস্টাইন তার মৃত্যুর বছরখানেক আগে নোবেলের জন্য তার শেষ মনোনয়ন পাঠান 1954 সালে। এবার তিনি মনোনীত করেছিলেন ওয়্যালদার বোথে কে। বোথে আইনস্টাইনের জীবদ্দশাতেই সেই 1954 সালেই পদার্থবিদ্যার নোবেল পেলেন তবে সেই পুরস্কারের আর এক অংশীদার ছিলেন। তিনি জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ন, আইনস্টাইনের এক সময়কার সহকর্মী ও বন্ধু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বোথে ছিলেন জার্মানির বিখ্যাত পরমাণু প্রকল্প ইউরেনভারিয়েন (Urenverien বা Uranium Club) এর এক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন পরমাণু বোমা বানানোর কাজ চলেছে এবং যে কাজে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে লেখা আইনস্টাইনের একটি চিঠির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, সেই সময় জার্মানিও চেষ্টা চালাচ্ছে পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের। আর সেই কাজে অন্যতম হোতা হচ্ছেন বোথে। তবু আইনস্টাইন কিন্তু ওয়্যালদার বোথের নাম নোবেলের জন্য সুপারশ করতে দ্বিধা করেন নি কারণ বোথে ছিলেন একজন প্রথম সারির পদার্থবিদ এবং নানা শাখায় তার গবেষণাকাজ ছিল উল্লেখযোগ্য। তাই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ম্যাক্স বর্ন ও বোথের একটি নোবেল ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো।

1919 থেকে শুরু করে 1954 পর্যন্ত আইনস্টাইন মোট এগারো জন বিজ্ঞানীকে নোবেলের জন্য মনোনয়ন দিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেই নোবেল জয় করেছেন এবং আইনস্টাইনকে মনোনয়নপত্র পাঠানোর পরে তার ফলাফল দেখার জন্য খুব একটা অপেক্ষা করতে হয় নি। কেবলমাত্র আরউইন শ্রোয়ডিঙ্গার ছাড়া তিনি কারও জন্য একবারের বেশি মনোনয়ন পাঠান নি এবং এই এগারো জন বিজ্ঞানীর একজন পেয়েছেন রসায়নের নোবেল, আর বাকীরা সকলেই পদার্থবিদ্যার নোবেল জয় করেছেন।

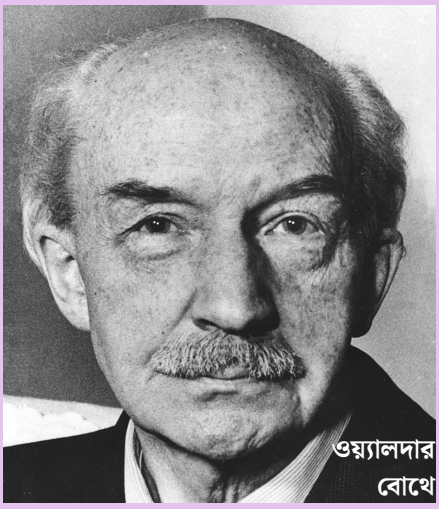
ওয়্যালদার বোথে

সত্যেন্দ্রনাথ বোস

তবে ভারতীয় হিসেবে আমাদের একটা খটকা থেকে যায়। 1924–25 এর পরে আইনস্টাইনের কি একবারও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্য মনোনয়নপত্র পাঠানোর কথা মনে হয় নি? ভারতবর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে 1924 সালে যে গবেষণাপত্র সত্যেন্দ্রনাথ বার্লিনের অধ্যাপক আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন সেই পেপারকে কিন্তু বিশ্বমঞ্চে তুলে এনেছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। কেবল তাই নয় সেই পেপারে সত্যেন্দ্রনাথের কষা ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে আইনস্টাইন তার দুটি পেপার লিখেছিলেন যেখানে ছিল বোস-আইনস্টাইন কন্ডেন্সেটের বীজ। তত্ত্বগতভাবে দেখানো হয়েছিল কীভাবে কোয়ান্টাম স্টেটকে প্রায় চরম শূন্যের খুব কাছের তাপমাত্রায় এবং অতি নিম্ন চাপে পাওয়া যেতে পারে। পদার্থের পঞ্চম অবস্থা হিসেবে পরিচিত এই পরিঘটনাটির পরীক্ষাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন নি, তা দেখাই যাচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথ নোবেল পান নি, পুরস্কারটির জন্য মনোনয়নও পেয়েছেন অনেক পরে। কিন্তু কে জানে আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথকে মনোনীত করলে ইতিহাস অন্যরকম হত কিনা।

1924–25 এর পরে আইনস্টাইনের কি একবারও সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্য মনোনয়নপত্র পাঠানোর কথা মনে হয় নি?

একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আইনস্টাইন যে বিজ্ঞানীদের জন্য মনোনয়ন পাঠিয়েছিলেন তাদের জন্য অন্য আরও কিছু বিজ্ঞানীও বিভিন্ন সময়ে এবং তার পুরস্কারের বছরেও মনোনয়ন পাঠিয়েছেন। তাই একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে কেবল আইনস্টাইনের মনোনয়নের ওপর ভিত্তি করে কিছু বিজ্ঞানীকে নোবেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইন যাদের মনোনীত করেছেন তারা সকলেই পুরস্কার জয় করেছেন এবং তার মনোনয়নের পরে বেশ দ্রুত সেই পুরস্কার তাদের হাতে এসেছে। সেই অর্থে আইনস্টাইন লক্ষ্যভেদী। এই কৃতিত্ব সম্ভবত খুব কম বিজ্ঞানীরই রয়েছে। এখানেও আইনস্টাইন এক অনন্য অবস্থানে বিরাজমান।

লেখক ***ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী*** *কলকাতায় সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabhu@gmail.com

পৃথিবী যেভাবে সবুজ হল

অরুণাভ দত্ত

2153 সালের এক দিন সকালে ভুজঙ্গবাবু চা আর বিস্কুটের স্বাদের পিলটা গিলে নিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। ভুজঙ্গবাবু এক জন বৈজ্ঞানিক। তিনি গবেষণাগারে বসে একটা নতুন যন্ত্র তৈরি করছেন। এই যন্ত্রটা তৈরি হলে...

"বাবা।"

ভুজঙ্গবাবু মুখ তুলে দেখেন তার ছেলে বুল্টাই বুদবুদের মতো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ঘরের ভিতর ঢুকছে। সম্প্রতি একটা নয়া রকমের জুতো বাজারে এসেছে। জুতো জোড়া পায়ে দিলে শূন্যে ভেসে ঘোরাঘুরি করা যায়। বুল্টাইয়ের দশ বছরের জন্মদিনে ভুজঙ্গবাবু তাকে জুতো জোড়া উপহার দিয়েছেন। "এখন কাজের সময় ডাকাডাকি করছ কেন বুল্টাই?"

"বাবা তোমার আলমারিতে এটা ছিল। এটা কী জিনিস?"

ভুজঙ্গবাবু দেখলেন বুল্টাইয়ের হাতে ধরা আছে একটা আস্ত বই। বই আজকাল দুর্লভ বস্তু। এখন বই, কাগজ আর কেউ পড়ে না। এখন আট থেকে আশির হাতে হাতে আলট্রা স্মার্টফোন। তা দিয়েই সকলের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই মিটে যায়। নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা বই, লাইব্রেরি

কখনও চোখে দেখেনি। ভুজঙ্গবাবুর আলমারিতে এই একটি মাত্র বই অক্ষত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। বইয়ের মলাটে লেখা আছে, 'রূপসী বাংলা – জীবনানন্দ দাশ'। ভুজঙ্গবাবু উত্তর দিলেন, "ওটা একটা কবিতার বই।"

বুল্টাই বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বলল, "এর মধ্যে অনেক কথাই লেখা আছে। কিন্তু সে সবের মানে জানি না।"

"যেমন?"

"এই যে, 'চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে চুপ; ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে', এ সব কথার মানে কী?"

"পল্লব মানে পাতা?"

"পাতা কী?"

"পাতার অনেক অর্থ। যেমন, বইয়ের মধ্যে যেখানে লেখা ছাপা থাকে, তাকে পাতা বলে। আমাদের চোখে থাকে চক্ষুপল্লব, সেটাও পাতা। আবার গাছেও থাকে পাতা, যার মাধ্যমে গাছ সালোকসংশ্লেষ চালায়। আর জাম, বট, কাঁঠাল, হিজল, অশ্বত্থ, ফণীমনসা এগুলো এক একটা গাছের নাম।"

"গাছ কী?"

গাছ কী তা বোঝাতে হচ্ছে ছেলেকে। ভেবেই লজ্জা পেলেন ভুজঙ্গবাবু। আসলে 2153 সালের পৃথিবীতে গাছপালা, ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, মাঠ, পুকুর, ডোবা এ সব আর কিছুই নেই। পৃথিবী থেকে সবুজ ধুয়ে-মুছে গিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে মানুষের থাকা, খাওয়া, বিনোদনের জন্য দৈত্যাকার ইমারতগুলো। নানা দুরারোগ্য রোগের বাড়বাড়ন্তে দিকে দিকে বেড়েছে হাসপাতাল। এখন মানুষের সব সময়ের সঙ্গী অক্সিজেনের সিলিন্ডার। ভুজঙ্গবাবু আর বুল্টাইয়ের সঙ্গেও রয়েছে। বন নেই, তাই নেই বন্যপ্রাণী, পাখি, কীটপতঙ্গ। চাষের জমি হাওয়া হয়েছে। মানুষ তাই খাবারের পরিপূরক হিসেবে পিল খেয়ে জীবনধারণ করে। নদীনালা সব শুকিয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের নোনা জলকে পানযোগ্য করে কোনও রকমে কাজ চালানো হচ্ছে। নেই বর্ষা, শীত, বসন্তের মতো ঋতুও। সে বার যখন ভুজঙ্গবাবু বলেছিলেন, "খুব মনে পড়ে বর্ষায় খিচুড়ি আর ইলিশ ভাজা, শীতের নলেন গুড়ের পায়েস।" তখন বুল্টাই জিজ্ঞাসা করেছিল, "খিচুড়ি, ইলিশ মাছ, নলেন গুড়, এগুলো

আবার কী?” এখন বুল্টাই জিজ্ঞেস করল, “গাছ কী বাবা?”

“পরে বুঝিয়ে দেব। এখন যাও।” বুল্টাই আবার শূন্যে ভেসে ভেসে প্রস্থান করল। ভুজঙ্গবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ‘সত্যি, পৃথিবী যে আবার কবে সবুজ হবে?’ ভুজঙ্গবাবু আবার নিজের কাজে মন দিয়েছেন। তিনি এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করছেন। এই যন্ত্রটা এক বার তৈরি হয়ে গেলে...

“ভুজঙ্গবাবু ব্যস্ত নাকি?”

ভুজঙ্গবাবু দেখলেন তাঁর পড়শি গোবিন্দবাবু ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারছেন। ফের ব্যাঘাত! ভুজঙ্গবাবু উত্তর দিলেন, “তা আছি একটু।”

“কী করছেন?”

ভুজঙ্গবাবু রেগেমেগে বললেন, “খই ভাজছি।”

“খই পরে ভাজবেন। আগে এটা দেখুন, আমার এক অদ্ভুত অ্যালার্জি হয়েছে।” বলেই গোবিন্দবাবু জানলা দিয়ে নিজের ডান হাতখানা গলিয়ে দিলেন।

ভুজঙ্গবাবু দেখেন গোবিন্দবাবুর ডান হাতের আঙুলগুলো কেমন সবজেটে। আঙুলগুলোর উপর শ্যাওলার মতো একটা সবুজ আস্তরণ জন্মেছে। “এ কী করে হল?”

“আর বলবেন না মশাই। পরশু দিন সন্ধের দিকে ছাদে পায়চারি করছি। দেখলাম আকাশ থেকে কী একটা বস্তু ছাদে এসে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখি একটা পাথরের টুকরো। অমন পাথর আমাদের পৃথিবীতে পাওয়া যায় বলে শুনিনি। পাথরটা তুলে নিতেই হাতখানা যেন জ্বলে গেল। পরে দেখি এই হাতে শ্যাওলার মতো বস্তুটা গজিয়ে উঠেছে! অ্যালার্জিটা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ডাক্তার বিশ্বাস বললেন যে, তিনি নাকি এমন অ্যালার্জি কখনও দেখেননি।”

“সেই পাথরটা এখন কোথায়?”

“সেদিনই ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। অতি ভয়ানক পাথর মশাই!” এমন অদ্ভুত অ্যালার্জি ভুজঙ্গবাবুও প্রথম দেখছেন। গোবিন্দবাবু তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরও দশ বাড়িতে তা দেখাতে গেলেন। ভুজঙ্গবাবু আবার ভাবলেন, ‘পৃথিবীতে কত অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ এল! দশ দিক দূষণে ছেয়ে গিয়েছে! না, পৃথিবীটা আর সবুজ না হলে চলছে না দেখছি।’

ভুজঙ্গবাবু আবার তাঁর যন্ত্র নিয়ে পড়লেন। যন্ত্রটা প্রায় তৈরি হয়েই এসেছে। ভুজঙ্গবাবু জানেন যে, এই যন্ত্র তৈরি হলে বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটে যাবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে কানে শোনা যাবে সকলের মনের কথা। আর কোনও কিছুই মানুষের অশ্রুত থাকবে না। যন্ত্রটাকে দেখতে ঠিক সরু নলওয়ালা বন্দুকের মতো। যন্ত্র থেকে একটা তার বেরিয়েছে, তাতে লাগানো আছে দুটো স্পিকার। ওই বন্দুকের নল কারও দিকে তাক করে যন্ত্র চালু করলেই স্পিকারের মাধ্যমে শোনা যাবে মনের কথা। যন্ত্র তৈরি শেষ হলে ভুজঙ্গবাবু ভাবলেন, কার উপর যন্ত্রটা পরীক্ষা করবেন। ভর দুপুরে ভুজঙ্গবাবুর গিন্নি ঘরে বসে আসন বুনছিলেন। ভুজঙ্গবাবু চুপিসারে গিন্নির দিকে যন্ত্রটা তাক করলেন। তাঁর কানে গোঁজা আছে স্পিকার। যন্ত্রের সুইচ টিপতেই ভুজঙ্গবাবুর কানে ভেসে এল গিন্নির মিহি কণ্ঠস্বর, ‘কোমরের ব্যাথায় জেরবার হয়ে যাচ্ছি। বুল্টাইয়ের বাবাকে বলতে হবে ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য একটা রোবট কাজের লোক রাখার জন্য।’

ওই বন্দুকের নল কারও দিকে তাক করে যন্ত্র চালু করলেই স্পিকারের মাধ্যমে শোনা যাবে মনের কথা।

ভুজঙ্গবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। রোবট কাজের লোক রাখার খরচ অনেক। তাদের চালু রাখার জন্য যে ব্যাটারি লাগে তা গৃহস্থকেই জোগাতে হয়, আর প্রতি সপ্তাহে সেই দামি ব্যাটারি কিনতে কিনতে ভুজঙ্গবাবু ফতুর হয়ে যাবেন। ভুজঙ্গবাবু নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করলেন। বাড়ির বাইরে পাঁচিলে একটা সাদা বিড়াল ঘুমোচ্ছিল। কুকুর, বিড়ালের সংখ্যা আজকাল নিতান্তই কম। এই বিড়ালটা হঠাৎ এক দিন কোত্থেকে উদয় হয়েছিল। বিড়ালটার লম্বা ছুঁচলো কান, দু চোখে নীল রঙের

উজ্জ্বল দুটি মণি, গায়ের মোটা মোটা লোম। বুল্টাই বিড়ালটাকে খেতে দেয়, আদর করে। বিড়ালের যা খাদ্য অর্থাৎ মাছ, দুধের স্বাদসম্পন্ন পিল নির্বিবাদে খেয়ে নেয় সে। এই বিড়ালটাকে দেখলে ভুজঙ্গবাবুর ভয় ভয় লাগে। বিড়ালটা মানুষ দেখলে তার চামরের মতো লেজখানা মাটিতে আছড়াতে থাকে। মনে হয় যেন মানুষগুলো তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ভুজঙ্গবাবু এখন যন্ত্রটা তুললেন। এ যন্ত্র বিড়ালের উপর কাজ করবে কিনা ভুজঙ্গবাবু জানেন না। উত্তেজনায় তিনি টইটম্বুর। বিড়ালটা চোখ খুলে তাকাল। ভুজঙ্গবাবু সুইচ টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানে ভেসে এল একটা খোনা কণ্ঠস্বর, 'ওহে হাঁদারাম, এখন যত ইচ্ছে কেরামতি দেখাও, আর ক'দিন পরেই তোমরা মজা টের পাবে, তখন এই পৃথিবীতে বাস করব শুধু আমরা।' ভুজঙ্গবাবু অবাক হয়ে ভাবলেন, কুকুর, বিড়ালরা কি তবে আমাদের সম্বন্ধে এমনটাই ভাবে?

এ দিকে গোবিন্দবাবুর হাতের অ্যালার্জি ভয়ানক হয়ে উঠেছে। কয়েক দিনের মধ্যে সেই বিরল অ্যালার্জি গোবিন্দবাবুর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন মনে হচ্ছে গোবিন্দবাবু সারা গায়ে শ্যাওলা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনকি তার পরিবারের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে অ্যালার্জিটা। গোবিন্দবাবুর খবরাখবর নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভুজঙ্গবাবু দেখতে পেলেন ঘোষেদের বাড়ির কার্নিসে বসে আঁচাবার সময় বিড়ালটা তাঁর দিকে এমন ভাবে তাকাল, যেন সে বলতে চাইছে, 'কী, মজা টের পাচ্ছ তো?'

কয়েকদিন পর পাড়ার ননী পিসিমারও সেই অ্যালার্জি হল। ননী পিসিমাও নাকি রাত্রিবেলায় একটা পাথর খুঁজে পেয়ে সেটা স্পর্শ করতেই তার গায়ে শ্যাওলা গজিয়ে উঠেছে। তার পর বটকৃষ্ণ হালদার, কার্তিক সামন্ত, হরি পাল এদের বাড়িতেও ঢুকে পড়ল সেই অ্যালার্জি। অবশেষে রোগটা পাড়া ছাড়িয়ে শহরের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই বলে রাত্রি হলেই আকাশ থেকে পাথরের টুকরো এসে পড়ছে, আর সেটা ছুঁলেই গায়ে গজিয়ে উঠছে শ্যাওলার মতো এক অদ্ভুত বস্তু।

মাস খানেকের মধ্যে এই শ্যাওলা রোগ ভীষণ আকার ধারণ করল। দেখা গেল, পৃথিবীর বহু দেশে এই অ্যালার্জি ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন ওই অ্যালার্জিতে। রোগটা মারাত্মক ছোঁয়াচে। তীব্র গতিতে এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়িয়ে পড়ছে অবলীলায়। রোগাক্রান্তদের গৃহবন্দি থাকতে বলা হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রশাসনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে পাথর, বালি, রসগোল্লা যা-ই পড়ুক না কেন, কেউ যেন না ছোঁয়।

ব্যাপার দেখে ভুজঙ্গবাবুর তাক লেগে যায়। তার মনে পড়ে সেই বিড়ালটার কথা। দেখেন তাঁদের বাড়ির পাঁচিলে বসে বিড়ালটা লেজ দোলাচ্ছে। ভুজঙ্গবাবু আবার তার দিকে যন্ত্র তাক করেন আর শুনতে পান, 'আর কেরামতি দেখিও না। এবার তুমিও খেসারত দেওয়ার জন্য তৈরি হও।'

"কোন খেসারত?" জানতে চান ভুজঙ্গবাবু।

'এই যে, দিনের পর দিন ধরে তোমরা পৃথিবীর উপর যে অত্যাচার করেছ, প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছ। তাই তোমাদেরকেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজে লাগাব আমরা।'

এই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পৃথিবীই বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত এবং সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ।

"তোমরা মানে? বিড়ালরা?"

'ওহে হাঁদারাম, আমি বিড়াল হতে যাব কেন? আমি হলাম জি-288 গ্রহের প্রাণী। এখানে বিড়াল সেজে আছি।'

"কেন?"

'জি-288 গ্রহের প্রাণীদের পৃথিবীতে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি। আমাদের গ্রহটা পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে। সে গ্রহটা আর বসবাসযোগ্য নেই। তাই আমরা প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল একটা গ্রহের সন্ধানে ছিলাম। আমরা জানতে পেরেছি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পৃথিবীই বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত এবং সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল সরেজমিনে সব দেখার জন্য। তবে দেখেশুনে বুঝলাম তোমরা মানুষরা পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছ। পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলেছ। তাই সবার আগে প্রয়োজন এই পৃথিবীটাকে আমাদের বসবাসের পক্ষে অনুকূল করে তোলার। এখন সেই কাজই হচ্ছে। ওই সব পাথরগুলো আমাদের গ্রহ থেকেই পাঠানো হচ্ছে।'

"আমাদের ধ্বংস করতে ওগুলো পাঠাচ্ছ তো?"

'ধুর হাঁদারাম, ওগুলো তো পৃথিবীতে প্রাণের জোগান হিসেবে পাঠাচ্ছি আমরা। পৃথিবীর প্রাণের জোগান যা ছিল, সবই তো তোমরা ধ্বংস করেছ।'

"মানে?" বিড়ালটা আর উত্তর দিল না। পাঁচিল থেকে নেমে কোথায় চলে গেল। ভুজঙ্গবাবুর ভয়ে বুক দুরদুর করে উঠল। দিন কয়েক পরে আবার নতুন ব্যাপার আরম্ভ হল। যারা ওই

অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। তাদের গায়ে চামড়া, মাংস খসে পড়ছে। শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠছে। তারা চলা-ফেরার, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলছে। তারা যেন ক্রমেই হয়ে উঠছে অনড় উদ্ভিদের মতো! ব্যাপার দেখে ভুজঙ্গবাবুর রক্ত জল। তিনি এবার বুঝলেন যে, বিড়ালরূপী ওই ভিনগ্রহী প্রাণীটা কোন খেসারত দেওয়ার কথা বলছিল। ভুজঙ্গবাবু বিড়ালটাকে বললেন, "আচ্ছা, আমরা কি মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করতে পারি না?"

'না। কারণ তোমাদের মতো হদ্দ বোকা আমরা আর দেখিনি। তোমরা প্রাণের জোগানকে ধ্বংস করো, প্রকৃতিকে নষ্ট করো, কোনওদিন হয়তো আমাদেরও বিপদে ফেলবে। নামে মানুষ হলে কী হবে, আসলে তোমরা মান আর হুঁশ খুইয়ে বসে আছ।'

"তা বলে আমাদের মেরে ফেলবে?"

'মরবে কেন? তোমরা বেঁচে থাকবে আমাদের প্রাণের জোগান হয়ে।'

এর পর ভুজঙ্গবাবু যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন, তাতে তাঁর চোখ কপালে উঠল। গোবিন্দবাবু, ননীপিসিমা, বটকৃষ্ণ হালদারদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতারাতি উবে গিয়েছে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ। শুধু দিকে দিকে গজিয়ে উঠেছে অনেক নতুন গাছপালা। রাতারাতি মানুষ কমছে, গাছপালা বাড়ছে। আশ্চর্য! 'পৃথিবী তা হলে সবুজ হচ্ছে!' কথাটা ভেবেই ভয়ে কাঁপতে লাগলেন ভুজঙ্গবাবু। হঠাৎ করে কী ভাবে পৃথিবীতে এত গাছপালা জন্মাল? কোথায় গেল মানুষগুলো? ভুজঙ্গবাবু কাঁপা হাতে তুলে নিলেন সেই যন্ত্র আর বিড়ালটার দিকে তাক করে বললেন, "মানুষগুলো যাচ্ছে কোথায়?"

বিড়ালটা নীরবে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। রাতের কালো আকাশ। অসংখ্য নক্ষত্রের মেলা। হঠাৎ আকাশ থেকে একটা পাথরের টুকরো ভুজঙ্গবাবুর পায়ের কাছে এসে পড়ল। ভুজঙ্গবাবু সভয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু এ কী! এ যে সোনা! অন্ধকারে জ্বলছে। আকাশ থেকে থরে থরে সোনা এসে পড়ছে! ভুজঙ্গবাবুর হাত থেকে যন্ত্রটা পড়ে গেল। তিনি ছুটে গিয়ে সোনার টুকরোটা তুলে নিলেন। মুহূর্তে সে সোনা পাথরে বদলে গেল। ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন ভুজঙ্গবাবু। তাঁর হাত বেয়ে উঠে আসছে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ। ভুজঙ্গবাবু মাটিতে পড়ে গেলেন। দেখলেন বিড়ালটা আকাশের দিকে তাকিয়ে তার সামনের একখানা পা ঘুরিয়ে কাকে যেন ডাকছে। সেইসঙ্গে আকাশে ফুটে উঠছে অনেকগুলো আলো। ধীরে ধীরে সেগুলো নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে...

2153 সালের এক সকালে পৃথিবীর মাটিতে পা রাখল জি-288 গ্রহের অদ্ভুত দর্শন প্রাণীরা। তারা দেখল সবুজে সবুজে ছেয়ে গিয়েছে পৃথিবী। যেদিকে তাকানো যায় শুধুই সবুজ গভীর অরণ্য। বাতাসে সতেজ ভাব। সকলে প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগল সেই সবুজ পৃথিবীর অদ্ভুত সৌন্দর্য। ●

লেখক ***শ্রী অরুণাভ দত্ত*** *জনপ্রিয় কল্পবিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞানকর্মী। ইমেল: wrarunabha18@gmail.com*

সূর্য নিয়ে শোরগোল

অতনু কুমার দে

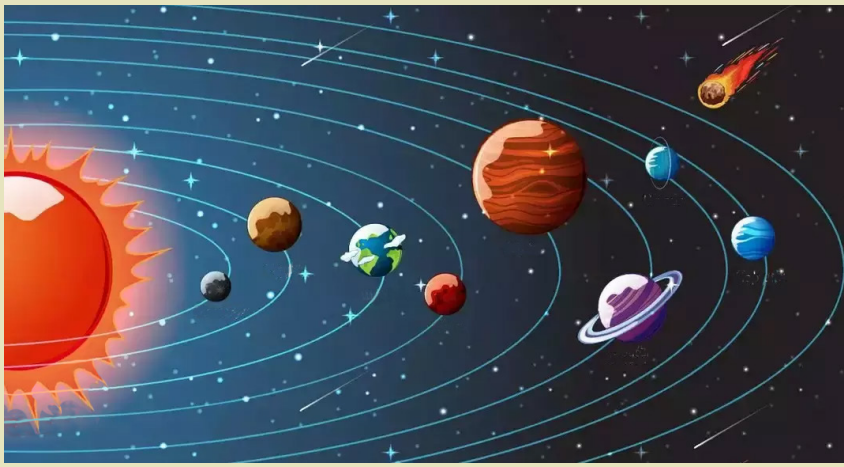

সকল শক্তির উৎস সূর্য, যা আমাদের প্রাণপূর্ণ পৃথিবীর জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যাকে ছাড়া আমাদের জীবনযাপন অসম্ভব। তার আবার অনেক নাম একটু সাজিয়ে বললে দাঁড়ায়—

আদিত্য, রবি, মিত্র, ভাস্কর
তপন, ভানু, বিভাবসু, দিবাকর,
মাতন্ড, মিহির, পূষা, প্রভাকর।

এ লেখা যন্ত্রস্থ হবার আগেই আমরা জেনে গেছি এক আদিত্য গেছে অন্য আদিত্যে মানে সূর্য স্থানে। এতক্ষণ সারা দুনিয়াতে বার্তা রটে গেছে মহাকাশ বিজ্ঞানের খাতায় নতুন ইতিহাস রচনা করেছে ভারত। গত 2 সেপ্টেম্বর 2023 অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেইকেল বা পি এস এল ভি–সি 57 রকেট চেপে যাত্রা শুরু করেছে সূর্যতপা আদিত্য এল-ওয়ান।

কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই আমার মনকে নাড়া দেয় তা হল রবি কবির গান—

“আকাশ ভরা, সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি, পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে, তাই জাগে, জাগে আমার গান .....”

আদিকাল থেকেই দিনের সূর্য আর রাতের গ্রহ নক্ষত্রে এবং সকল মহাজাগতিক বস্তুকে নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। অপার বিস্ময়ে অজানাকে জানা আর অচেনাকে চেনার অদম্য বাসনা নিয়ে কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে তৈরি হয়েছে মানুষের চিন্তার বুনিয়াদ।

আজ আমরা জানি পৃথিবী এবং অন্যান্য সকল গ্রহই সূর্য কেন্দ্রিক। সূর্য আপাত স্থির। সূর্যকে কেন্দ্র করেই সকলে ঘুরছে। সৃষ্টির প্রথম থেকেই একই নিয়ম। অথচ এক সময় মানুষের ধারণা ছিল ভিন্ন। সকালে উঠে তুমি দেখলে পূর্বদিকে সূর্য উঠলো, আর বিকালে পশ্চিম দিকে অস্ত গেলো, অতএব সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্যকেই গতিময় বলে মনে হয়। হাজার হাজার বছর ধরে এই বিশ্বাস মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়েছে বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদ্বয় অ্যারিস্টটল এবং টলেমী ছিলেন এই মতেরই পৃষ্ঠপোষক। সকল মানুষ তো এই ধারণাকে বিশ্বাস করবেই। এতে আর অবাক হবার কি আছে?

এই ধারণাকে নস্যাৎ করে প্রথম যুক্তিনিষ্ঠ বিরোধিতা করলেন পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (1473–1547) তিনি বললেন সূর্য স্থির পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে।

খ্রিস্টের জন্মের 587 বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্রিক দার্শনিক গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী পিথাগোরাস। তিনি সর্বপ্রথম বলেছিলেন পৃথিবী গোল। গ্রিক গণিতবিদ, ভূগোলবিদ জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী ক্লোডিয়াস টলেমি (আনুমানিক 100–170 খ্রিস্টাব্দ) বলেছিলেন, পৃথিবী স্থির, সূর্য অবিরত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

টলেমির ধারণায় ভুল থাকলেও গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ে তার গাণিতিক জ্ঞানকে অস্বীকার করা যায় না। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞান (astronomy) এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র (astrology) দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিপরীত ধর্মী বিষয়। কিন্তু প্রাচীনকালে এটি একটিমাত্র বিষয় বলেই গণ্য হতো। যেহেতু তখন বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত যন্ত্র ও প্রমাণের অভাব ছিল।

আমাদের ছোটবেলাতেও যেটা সত্য বলে জানতাম “নয়ে নবগ্রহ, দশে দিক”, কি সেই নবগ্রহ?—সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু। আজ কিন্তু একটি শিশু যে শিক্ষাঙ্গনে এসেছে সে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে দেবে, সূর্য একটি তারা বা নক্ষত্র। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ, রাহু আর কেতু সম্পর্কে ওদের কোন ধারনা নেই, এছাড়া প্লুটো (Pluto) কে ওরা বামন গ্রহ (dwarf planet) হিসেবে জানে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণা সত্যের আলোকে পরিবর্তনশীল। সূর্য থেকে প্রত্যন্ত দূরের গ্রহ ইউরেনাস, নেপচুন এর খবর পাওয়া গিয়েছিল টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পরে। আর প্লুটো (Pluto) আবিষ্কৃত হয় 1930 খ্রিস্টাব্দের 18ই ফেব্রুয়ারি। প্রথমে গ্রহের তালিকায় এর স্থান হলেও 2003 সালে একে গ্রহের তালিকা থেকে সুনির্দিষ্ট কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার কারণটাও বেশ মজার।

একে একে বিভিন্ন গ্রহের চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো উপগ্রহ সকল আবিষ্কৃত হতে থাকে। তাদের কয়েকটি প্লুটোর থেকে আয়তনে আকৃতিতে বড়। গ্রহের থেকে যদি উপগ্রহ বড় হয় সেটা কেমন দেখায়! ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU) সূর্য প্রদক্ষিণকারী বস্তুগুলিকে পুনঃ শ্রেণীবিন্যাস করেন, তারা হলো গ্রহ, বামন গ্রহ, উপগ্রহ।

বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুগে যুগে পাল্টিয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ আমরা পেয়েছি, কোপার্নিকাসের তত্ত্বে। 1491 সালে কোপার্নিকাস ক্রোকো বিশ্ববিদ্যালয় এ অধ্যয়ন করতে আসেন। তখন পোল্যান্ডের রাজধানী ছিল ক্রোকো। সেখানকার বিষয় ছিল দর্শন, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা। সে সময় উপনিবেশ

প্রতিষ্ঠার কালে সমুদ্রবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রাধান্য দেওয়া হতো। কারণ সমুদ্রযাত্রার ভরসা ছিল জ্যোতির্বিদ্যা। বিভিন্ন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ অধ্যাপকদের সাহচর্যে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

ছোটবেলায় তার যখন মাত্র আট বছর বয়স তখন তার পিতা মারা যান। পিতার অবর্তমানে মামা তার সহায় হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন এরমাল্যান্ড গির্জার বিশপ। তার একান্ত ইচ্ছে ছিল ভাগ্নেকে ধর্মযাজক বানাবার। 1500 সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেও সে কাজ ভালো না লাগায় পোল্যান্ডে ফিরে এলেন কোপার্নিকাস। 1501 সালে মামার ইচ্ছে পূরণের লক্ষ্যে ধর্মীয় আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্র পড়তে ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় পাঠানো হয় কোপার্নিকাসকে। অধ্যয়ন শেষে যখন তিনি ফিরে এলেন কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর অসুস্থ মামা মারা যান। গির্জা কর্তৃপক্ষ কোপার্নিকাসকে ওই গির্জার বিশপ হিসেবে নির্বাচিত করেন। প্রথম থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ থাকায় এইসব বিষয়ে গবেষণার ইচ্ছে তার মনে প্রকট হয় সে সময় দূরবীন না থাকায় গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে কেবলমাত্র উঁচু জায়গা বেছে নিতে হতো। পাহাড়ের উপরে ফ্রয়েনবার্গ গির্জা। তার পাশেই ছিল একটি উঁচু মিনার। এটাই তার গবেষণার স্থান হিসেবে বিবেচিত হলো। দীর্ঘদিনের গবেষণায় তাঁর উপলব্ধ সত্যিগুলি ছিল অভূতপূর্ব। তিনি টলেমির ভুলের কারণ সম্পর্কে অবহিত হন। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু ভাবতে গিয়েই টলেমি ভুল করেছিলেন বলে তার অভিমত। তিনি তার দীর্ঘ গবেষণা ও অনুশীলনের পর সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্যকে কেন্দ্র করেই গ্রহরা পরিক্রম করছে। এছাড়া পৃথিবীর রয়েছে দুটি গতি, একটি আহ্নিক অন্যটি বার্ষিক। অহ্ন মানে দিন তাই এই গতির জন্য দিনরাত হয়। বার্ষিক গতি যার জন্য হয় ঋতু পরিবর্তন। এইসব পর্যবেক্ষণের সময় তিনি একটি সৌরজগতের মানচিত্র অঙ্কন করেন।

তিনি বলেছিলেন সূর্য পরিক্রমণের গতিপথ বৃত্তাকার। পরে অবশ্য 1610 সালে বিজ্ঞানী কেপলার প্রমাণ করেছিলেন গ্রহগুলির গতিপথ উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি।

অবশ্য তার পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে একটি ভুল থেকে যায়, তিনি বলেছিলেন সূর্য পরিক্রমণের গতিপথ বৃত্তাকার। পরে অবশ্য 1610 সালে বিজ্ঞানী কেপলার প্রমাণ করেছিলেন গ্রহগুলির গতিপথ উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি।

কোপার্নিকাস তার উপলব্ধি ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান কে উপজীব্য করে একটি বই লেখেন 1531 সালে। বইটির নাম ‘রিভলিউশনিবাস অরবিয়ম সেলেস্টিয়াম’ যাকে সংক্ষেপে বলা হয় রেভোলেশনস। লিখে ফেললেও এই সময় এই বই প্রকাশের সাহস তাঁর ছিলনা। নতুন সত্যিকে মেনে নেওয়ার মতো উপযুক্ত যোগ্য লোকের অভাব ছিল। 1533 সালে রোমে তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে তার নতুন চিন্তাধারার কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মযাজকদের যুক্তিহীন সমালোচনার কোপে পড়েন। সংঘাত এড়াতে প্রায় 13 বছর তার এই বিখ্যাত বইটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। কোপার্নিকাসের বন্ধু জর্জ জোয়াসিম রেডিকাস ছিলেন তদানীন্তন উইটবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ওই বইয়ের কথা জানতে পেরে সত্যকে লুকিয়ে না রাখার পরামর্শ দেন, কোপারনিকাসের অনুমতি নিয়ে তাঁরই তত্ত্বাবধানে সেই বই ছাপা হয়। আধুনিক ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় সে বই ছাপতে অনেক সময় লেগেছিল। সেটা যখন ছেপে এসে পৌঁছালো তার প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই কোপার্নিকাস এর জীবন অবসান হয়। সময়টা ছিল 1543 সালের 24শে মে।

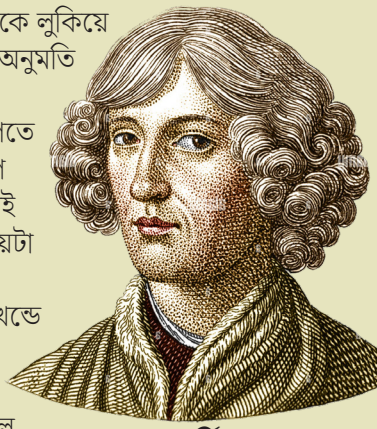

কোপার্নিকাস

বিশাল আকৃতির এই বইটি ছিল 6টি খন্ডে বিভক্ত তা উৎসর্গ করা হয় তদানীন্তন তৃতীয় পোপ কে। উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল—“গণিত শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান না থাকলে কেউ যেন এই বইটির ধর্মীয় অপব্যাখ্যা না দেন কেউ যেন সমালোচনা না করেন।” এই কথাটা না বললেই নয় বই প্রকাশের কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনি মরে গিয়ে একপ্রকার বেঁচে গিয়েছিলেন। কারণ গির্জা কর্তৃপক্ষ সেই বই “রিভলিউশনস”কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রায় দুশো বছর বইটির প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এত ধর্ম জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোপার্নিকাসকে ধর্মদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে তার মতবাদকে প্রচার করতে গিয়ে ধর্মমত্ত মৌলবাদী ধর্মযাজকদের সামনেই আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছে বিজ্ঞানী ব্রুনোকে, প্রভূত নির্যাতন ও কারাবরণের শিকার হতে হয়েছে বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে। কোপার্নিকাস ছিলেন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক একথা জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী জোয়ান কেপলার, গ্যালিলিও ও নিউটন কায়মনবাক্যে স্বীকার করে গেছেন।

সীমিত জ্ঞান ভান্ডার দিয়েও প্রাচীনকালে এই মহাবিশ্ব নিয়ে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে তখন পৃথিবী। তার চারিদিকে ঘুরছে সূর্য চন্দ্র এবং অগণিত নক্ষত্র।

একসময় বৈদিক সাহিত্যে মনে করা হতো আকাশের অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ নাকি স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের চক্ষু। দেবতার ইচ্ছের প্রতিফলনে গ্রহগুলোর অদ্ভুত গতিপ্রকৃতি। ইউরেনাস নেপচুন, প্লুটোদের অস্তিত্ব তখন আবিষ্কৃত হয়নি। সূর্য (রবি), চন্দ্র (সোম)—এরা গ্রহ হিসেবে স্থান পেয়েছে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ-এর ধারণা না থাকায় রাহু আর কেতু গ্রহের মর্যাদা পেয়ে গেল।

এইসব কল্পনা ও সংস্কার নিয়েই প্রাচীন জ্যোতিষ চর্চার শুরু। ভাবতে অবাক লাগে কল্পনার পাখায় ভর করে যে জ্যোতিষ শাস্ত্র-অচল, অনড়, চিরন্তন সেগুলি দেশ কালের গণ্ডি বেরিয়ে আর ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর ব্যাখ্যায় ভরে গেল। পরিবর্তনশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা না ভেবে সনাতন, শাশ্বত জ্যোতিষবিদ্যা ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে গেল। তখন সত্যের পিছনে নতুন কিছু জানার চেষ্টা ধর্ম বিরোধী চিন্তা হিসেবে গণ্য হলো। এ থেকেই প্রতিয়মান হয় ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস আর অন্ধকার কুসংস্কারময় বিশ্বাসের উৎস হল অজ্ঞানতা।

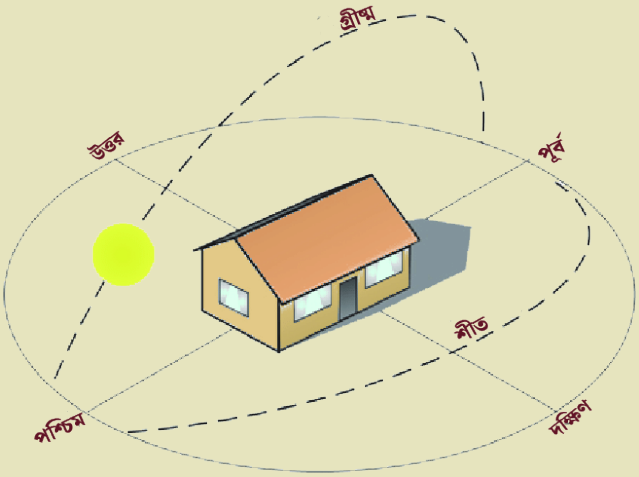

“বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর” এই নীতিবাক্য তখন মিথ্যে হয়ে যায়, বৈজ্ঞানিক বিচক্ষণতায়, তথ্য প্রমাণের যুক্তিতে। যুক্তি ছাড়া এই ধর্ম বিশ্বাসে ভর করে সমস্ত সংস্কার মানুষকে বিজ্ঞান চর্চায় বহুদিন বন্ধ করে দিয়েছিল। আর অন্ধবিশ্বাস জ্যোতিষ শাস্ত্র কে ধর্মব্যবসায় উন্নত করেছে। মহাকাশ গবেষণা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যুগ যুগ ধরে।

পরিবর্তনশীল মহাকাশে কেউই স্থির নেই এ কথাটা বিশ্বাস করতে বহু বছর লেগে গেল। খোলা চোখে দেখা যায় এমন সাতটি জ্যোতিষ্ক থেকেই আমাদের সাতটি বারের নাম এসেছে। রবি (সূর্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি (পাঁচটি দৃশ্যমান গ্রহ)। ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষেও সাতটি জ্যোতিষ্কের নাম উল্লেখ আছে।

মাথার উপর তাকালেই অর্ধবৃত্তাকার আকাশ, পায়ের তলায় অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও ওরকম অর্ধেক একটি আকাশ রয়েছে দুইএ মিলে যে মিলিত পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে সেটিকেই আমাদের সীমিত ব্রহ্মাণ্ড হিসাবে কল্পনা করা যায়। আমরা সূর্যকে প্রতিদিন পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি এছাড়া সারা বছর ধরে সূর্য যে পথে আপাত পরিচলন করে সেটা হল সূর্যমার্গ বা ক্রান্তি বৃত্ত (The Sun’s Path) । এই পথের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত একটি বেল্ট কল্পনা করলে ওই অঞ্চলের মধ্যেই পুঞ্জিভূত রয়েছে আমাদের পরিচিত গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ সকল।

আপেক্ষিক গতির নিরিখে চাঁদের, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতে 27 দিন সময় লাগে, সেই পথকে চিহ্নিত করতে 27টি নক্ষত্রপুঞ্জ কে নির্দিষ্ট নামে অভিহিত করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে—অশ্বিনী, ভরণী, কীর্তিকা, রোহিনী, অগ্রহায়ণী, আদ্রা, পূর্ণবসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব আষাঢ়া, উত্তর আষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদা, উত্তর ভাদ্রপদা, রেবতী।

কিন্তু মজার কথা হলো সূর্যকে প্রতিদিন যেমন আমরা পূর্বদিকেই উদয় হতে দেখি আবার পশ্চিম আকাশে অস্ত হতে দেখি, এই নিয়মটি শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

চাঁদ প্রতিটি মাসের পূর্ণিমার সময় যে নক্ষত্রে থাকতো সেই নক্ষত্রের নামেই নির্দিষ্ট মাসের নাম সূচিত হয়েছিল।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই চাঁদের আবির্ভাব ও চোখের আড়াল হওয়া প্রতিদিন একই সময়ে ঘটে না। কোনদিন চাঁদ মধ্যরাতে ওঠে কোনদিন ভোরের আলো ছায়ায়, আবার কখনো গোধূলি লগ্নে। সে কারণে চাঁদের গতির সহায়তায় কাল নির্ণয় করতে গিয়ে ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের হিমশিম খেতে হয়েছে। আবার আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গের কথা। সূর্যের আপাত বাৎসরিক পরিচলন পথটিকে 360 ডিগ্রি ধরে 12টি সমান ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগ 30 ডিগ্রি করে হয় প্রত্যেকভাগের নক্ষত্রদের কাল্পনিকভাবে যদি যোগ করা যায়, তার নিরিখে এক একটি আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। 12টি রাশি, তারা হল যথাক্রমে—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। প্রায় নিয়মিতভাবে সূর্য প্রতিটি মাসে এক একটি রাশি পরিভ্রমণ করে কিন্তু কোনও রাশি বাংলা মাসের নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

তাহলে মাসের নামগুলি কেমন করে এলো, কাল (সময়) বিভাগের ক্ষেত্রে যাদের পথকে অনুসরণ করে মাসের নাম রাখা হয়েছিল। চাঁদ প্রতিটি মাসের পূর্ণিমার সময় যে নক্ষত্রে থাকতো সেই নক্ষত্রের নামেই নির্দিষ্ট মাসের নাম সূচিত হয়েছিল। তেমনি ভাবেই পর্যায়ক্রমে বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব আষাঢ়া নক্ষত্র থেকে আষাঢ় মাস। এভাবেই শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাস এসেছে যথাক্রমে শ্রবণা, ভদ্রা, অশ্বিনী নক্ষত্রের নাম থেকে। বাকিগুলি নিয়ে একটি মজার খেলা নয় ছোটদের জন্য রইল। 27টি নক্ষত্রের নাম আগেই দেওয়া হয়েছে। বাকি ছটি মাসের নাম কোন কোন নক্ষত্রের নাম থেকে এসেছে তা বের করতে হবে।

মজার কথা হলো প্রাচীনকালে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে বিশাখা নক্ষত্র দেখা যেত, আজ কিন্তু তা যায় না। একইভাবে

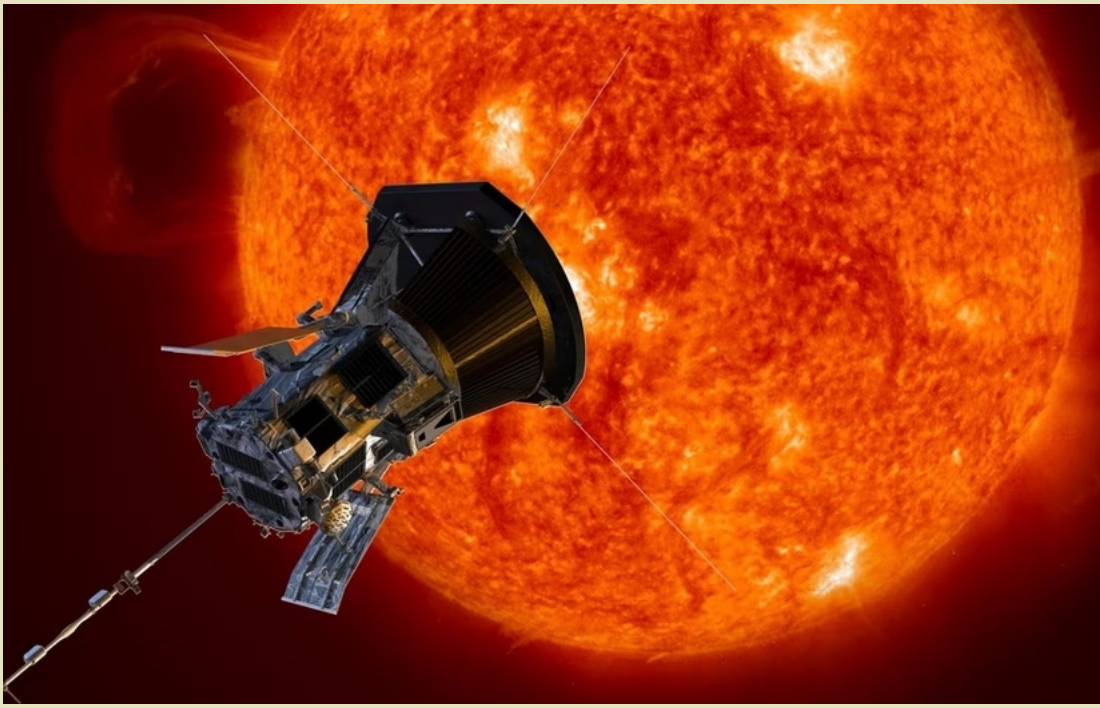

কোন নক্ষত্রই তার সংশ্লিষ্ট মাসে দেখা যায় না। আসলে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে আকাশ আর তার চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা অগণিত জ্যোতিষ্ক সেগুলি সর্বদাই সঞ্চরণশীল। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র সকলেই অস্থির। এমনকি আমাদের প্রাণপ্রিয় সূর্য সরছে কালের আবর্তে, সময়ের নিরিখে সেটা প্রায় স্থির বলেই ধরা হয়।

এ যুগে নক্ষত্ররা স্থান পরিবর্তন করেছে কিন্তু মাসের নাম গুলি একই রকম রয়ে গেছে। কালের হিসেব যদি চন্দ্রকেন্দ্রিক না হয়ে সূর্যকেন্দ্রিক হত তাহলে হয়তো অনেকটা সামঞ্জস্য থাকতো। রাশি গুলি যেমন ক্রান্তি বৃত্ত ধরে সুশৃংখলভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই অবধি বিজ্ঞান আর জ্যোতির্বিদ্যায় কোন পার্থক্য নেই কিন্তু অনেক দূরের রাশিভিত্তিক গণনায় মানুষের উপর তার প্রভাব ভবিষ্যতের চালিকাশক্তি এরকম সংস্কার বা কুসংস্কার বিজ্ঞানে গ্রহণীয় নয়।

জ্যোতিষীদের গণনার উপজীব্য বিষয় গুলি হল 27টি নক্ষত্র, বারটি রাশি আর পুরাতন ধারণায় নটি গ্রহ। তাদের বিশ্বাস, কোন মানুষ এর জন্মের সময়, চাঁদ যে রাশিতে অবস্থান করে সেটাই তার জন্ম রাশি। সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত। রাশি অনুযায়ী প্রত্যেক জাতক জাতিকার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো অনেক দূরের নক্ষত্রদের যদি প্রভাব থাকে তবে ইউরেনাস ও নেপচুন বাদ পড়ল কেন? আর মানুষের জন্ম সময়কেই পুজি করেই যখন এতসব গণনা, সেই সময়টাও বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত একটি সুবিধাজনক সময়। যে হাসপাতালে শিশুর জন্ম হলো সেই অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের ছেদবিন্দুর সময় নয়।

সুতরাং এরকম বুজরুকি কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ‘কম্পিউটারের সাহায্যে গ্রহ বিচার করা হয়’ বললেই সেটা বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে যায় না। জ্যোতিষ শাস্ত্র পরিবর্তনশীলতাকে বিশ্বাস করে না। তাই নবগ্রহ কবজেও গ্রহদের কে তুষ্ট করতে কাল্পনিক তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়।

সূর্যকে দেবতা ভাবতে বা শক্তির আধার ভাবতে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়, যখন আমাদের প্রাণ প্রদীপ, তার আলোকেই প্রানিত। সূর্য প্রণাম যোগাভ্যাসে আমরা দেহকে সুস্থ রাখতে পারি। এখানেও বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই।

শেষ কথায় ফিরে আসি, মহাকাশকে নিয়ে অজানার শেষ নেই, ভারতের সৌর অভিযান তেমনি বহু বিজ্ঞানীদের নিরন্তন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। আপাতত ভারতের সৌরযান এখন মাঝ রাস্তায়। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার আমাদের ভারতীয় সৌরযান, আদিত্য এল-ওয়ান যে সূর্য পরিক্রমায় বেরিয়েছে, সেই দূরত্ব মাত্র 15 লক্ষ কিলোমিটার। সেটা পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বের 100 ভাগের এক ভাগ মাত্র।

সূর্য আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যেখানে একে অপরকে প্রতিহত করে সেই পাঁচটি পয়েন্টের একটি হলো ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট। সেখানে গিয়েই সে পাক খেতে থাকবে আর সূর্য থেকে নিঃসৃত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের গতি প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ করবে। আদিত্য থেকে আসা তথ্য কে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা সৌর বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি যাতে মোকাবিলা করা যায় তার গবেষণা চালিয়ে যাবেন এবং সফল হবেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ●

*লেখক **শ্রী অতনু কুমার দে** অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মী এবং প্রিজ্‌ম সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ইমেল: deyanu.dey@gmail.com*

বাস্তবের নীলকণ্ঠ

দীপাঞ্জন ঘোষ

সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক কাহিনীটির সঙ্গে হয়ত সকলেই কমবেশি পরিচিত। ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশে দেবতা ও অসুররা সমুদ্রমন্থন শুরু করেন। ফলস্বরূপ চন্দ্র, শ্বেত হস্তী, মদিরা, পারিজাত বৃক্ষ প্রভৃতি অনেক কিছু একের পর এক সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে আসতে থাকে। এক সময় অমৃতের পাত্র নিয়ে হাজির হন ধন্বন্তরি। এদিকে দেবাদিদেব মহাদেব সমুদ্রমন্থনে নিমন্ত্রণ না পেয়ে যারপরনাই রুষ্ট হয়ে পড়েন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাগের মাত্রা কমে আসায় তিনি দ্বিতীয়বার মন্থনের আদেশ দেন। এইবার অমৃতের পরিবর্তে গরল বা বিষ উঠে আসে। এর ফলে, সমস্ত জাগতিক জীবের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। পশুপতি শিব বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, এই গরল যদি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাঁর নিজের হাতে সৃষ্ট জীবকুলের বিনাশকে কোনমতেই আটকাতে পারবেন না। উদ্বেগের বশে মহাদেব এক চুমুকে সমস্ত বিষ পান করে নিয়ে নিজের পেটের পরিবর্তে গলায় ধারণ করেন। বিষের প্রভাবে তাঁর গলা নীল হয়ে যায়। এই সময় থেকেই তিনি ‘নীলকণ্ঠ’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য পৃথিবী এবং সমগ্র জীবকুল সেই যাত্রায় রক্ষা পায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখতে বসে এমন একটা বহুচর্চিত পৌরাণিক কাহিনী আবার আওড়ালাম কেন? যদি বলি, কিছুটা হলেও আজকের পৃথিবীর অবস্থা অনেকটা সেই দিনের মত। যুক্তিগ্রাহ্য হবে? আসলে ‘সমুদ্র’ অর্থে যদি ‘সভ্যতা’, ‘বিষ’ অর্থে যদি ‘দূষক পদার্থ’ এবং ‘বৃক্ষ’ অর্থে যদি ‘নীলকণ্ঠ’ মহাদেবের মত সর্বংসহা সর্বশক্তিমানকে বোঝায়, তাহলে নিঃসন্দেহে প্রথমে বলা কাহিনীটি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু গাছের প্রজাতির সঙ্গে পুজোআর্চার একটা সম্পর্ক বার বার প্রতীয়মান হয়। সমাজ বিশেষজ্ঞদের মতে, সংরক্ষণের স্বার্থেই সেই সময় মূল্যবান গাছ ও বনকে দেবতা রূপে পুজো করা হত। এই ধরণের উপাচারের উল্লেখ ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্তোত্রের পাশাপাশি বামনপুরাণেও পাওয়া যায়। আজকের কুঞ্জবন বা সেক্রেড গ্রোভ (Sacred Groves) ধারণার উৎপত্তিও সম্ভবত এইখান থেকেই। অগ্নিপুরাণে গাছের পুজো প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে—গাছের পুজো মানুষকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বট, অশ্বত্থ, বেল, নিম, কদম, অশোক এবং করঞ্জ—এই বিশেষ কয়েকটি গাছকে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মত! পরবর্তীকালে গবেষণায় বায়ু বিশুদ্ধকারী হিসাবে গাছগুলির অসামান্য গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদের পূর্বজরা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার একদম গোড়ার দিকে পরিবেশ সচেতনতার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন ধর্মীয় উপাচারের মাধ্যমে। এমনকি সিন্ধু সভ্যতা থেকে উদ্ধার হওয়া একটি সীলমোহরও (চিত্র 1) তৎকালীন সমাজের সঙ্গে অশ্বত্থ গাছের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। সম্ভবত নিম ছিল সে সময়ের অপর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গাছ। আমাদের পূর্বপুরুষরা গাছেদের সাহায্য নিয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশ গঠন বা ফাইটোরিমিডিয়েশনের (Phytoremediation) অপরিহার্যতা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। গাছ যে আমাদের পরিবেশকে আরও আনন্দদায়ক এবং বাসযোগ্য করে তুলতে পারে, তাঁরা সেই বিষয়ে সম্যক ধারণা পোষণ করতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে উপলব্ধ কিছু

চিত্র 1: সিন্ধু উপত্যকা থেকে আবিষ্কৃত স্টেটাইট বা সোপস্টোন দিয়ে তৈরী একটি বর্গাকার সিলমোহরে অশ্বত্থ পাতার উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় (আনুমানিক 2600 খ্রিস্টপূর্বাব্দের)।

চিত্র 2: গাছকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় উপাচারের অন্তরালে পরিবেশ রক্ষার ভাবনা কাজ করেছিল।

চিত্র 3: পুরাণ মতে অশ্বত্থ (*Ficus religiosa*) একটি পবিত্র উদ্ভিদ।

নির্দিষ্ট প্রজাতির গাছ রোপণ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী (চিত্র 2) এবং সামাজিক নিষেধাজ্ঞার বিধান জারি করে, তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতার ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

প্রাচীন ভারতে পবিত্র গাছপালা সংরক্ষণের লক্ষ্যে একসময় উত্থাপিত বিধান বা নিয়মাবলী কেবল মাত্র বিজ্ঞানসম্মতই নয়, অত্যন্ত নজরকাড়াও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, বৃহৎসংহিতার এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, নিম গাছ (একটি সক্রিয় বায়ু পরিশোধক) বাগানে বা বাড়ির চত্বরে থাকলে পরিবারের কল্যাণের জন্য সহায়ক হবে। একইভাবে পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে, বাড়ির আশেপাশে নিম গাছ লাগালে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। কিছু প্রাচীন স্তোত্রে বলা হয়েছে, অশ্বত্থ গাছের শিকড়ে ব্রহ্মা, কাণ্ডে বিষ্ণু এবং গাছের পাতায় অন্যান্য দেবতার অবস্থান। তাই অশ্বত্থ গাছের (চিত্র 3) কোন ক্ষতি করা ঈশ্বরের ভ্রুকুটি আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার ব্রহ্মবৈধতপুরাণ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি অশ্বত্থ গাছ কেটে ফেললে, তার কৃতকর্ম তাকে সমাজের রোষের শিকার হতে বাধ্য করবে। অপর একটি প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, যখনই একটি বট গাছ কাটা হয়, তখনই পাপ হয়। অর্থাৎ প্রাচীন পুঁথিগুলির পাতার পর পাতা ধমক দিয়ে ঠাসা। এমনকি গাছ বা বনের ক্ষতিসাধন করলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক, শারীরিক এবং আর্থিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দস্তুর ছিল সেকালের রীতি। যেমন, মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে যে, ঝোপঝাড় কিংবা গাছপালা ধ্বংস করলে পাপীকে এক স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা দিতে হবে।

চিত্র 4: বাসস্থানের আশেপাশে বায়ু বিশুদ্ধকারী হিসাবে নিম গাছ (*Azadirachta indica*) রোপণ করার ভারতীয় ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

আজকের যুগে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিজ্ঞান গবেষণার পরে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণাগুলি নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, গাছপালা জীবন-সহায়ক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে পরিবেশের গুণমান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু কিছু গাছপালা ক্ষতিকর দূষক পদার্থ যেমন, ভারী ধাতুর দ্বারা দূষিত মাটি বা ভূগর্ভস্থ জল থেকে বিপজ্জনক পদার্থ অপসারণ করার ক্ষমতা রাখে। অধিকন্তু, তারা বায়ু থেকে দূষকগুলিকে ফিল্টার করতে পারে এবং এইভাবে বায়ু পরিশোধক (চিত্র 4) হিসাবে কাজ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, আম (*Mangifera indica*), বেল (*Aegle marmelos*), কয়েত বেল (*Limonia acidissima*), আমলকি (*Phyllanthus emblica*), তেঁতুল (*Tamarindus indica*), বট (*Ficus benghalensis*), নিম (*Azadirachta indica*) এবং অশ্বত্থ (*Ficus religiosa*) গাছের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই গাছগুলি (চিত্র 5) কোন স্থানের বাতাসের প্রায় 70–100 শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে ফেলতে সক্ষম। বাস্তবে, এই গাছগুলি ক্ষতিকারক দূষক পদার্থগুলির প্রতি এক হয় কম সংবেদনশীল অথবা অসংবেদনশীল। তাছাড়া বেশিরভাগ গাছই দেহে দূষক পদার্থের জৈবসঞ্চয়

চিত্র 5: আমলকি গাছ (*Phyllanthus emblica*) বাতাস শুদ্ধ করে।

(Bioaccumulation) করতে অভ্যস্ত। এমনকি, দূষক পদার্থগুলিকে দেহে ধারণ করা ছাড়াও, কিছু গাছপালা তাদের শরীর থেকে দূষক বার করে দিতে পারে বা কোন নিষ্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত করে দেহেই ধরে রাখতে পারে।

দূষক পদার্থগুলিকে উদ্ভিদ অঙ্গে ধরে রাখার ক্ষমতা কয়েকটি পারিপার্শ্বিক বিষয় যেমন, সেই স্থানের আবহাওয়ার পরিস্থিতি, দূষক পদার্থের প্রকৃতি, কণার আকার, উদ্ভিদপৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার ভারী ধাতু শোষণের মত ঘটনা মাটির *p*H, মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ, ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বড় পাতা বিশিষ্ট গাছগুলি তাদের পাতার উপরিতলে বায়ুবাহিত দূষক কণাগুলিকে ধরে রাখে। এইক্ষেত্রে কণার আকার ও ভর, বাতাসের বেগ, গাছের পাতার আকার, অবস্থান এবং পত্রপৃষ্ঠের আর্দ্রতা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাতার কার্যকারিতা নির্ভর করে।

ছাতিম (*Alstonia scholaris*), ডুমুর (*Ficus cunia*), মহুয়া (*Madhuca indica*), বকুল (*Mimusops elengi*), পাকুড় (*Ficus infectoria*), পলাশ (*Butea monosperma*), দেবদারু (*Polyalthia longifolia*), দুধসর (*Euphorbia neriifolia*), ইত্যাদি কিছু অতি পরিচিত গাছ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে বায়ুমণ্ডলকে শুদ্ধ করতে এবং বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য দূষণ প্রতিরোধী উদ্ভিদদের দ্বারা শহর ও শিল্প এলাকার চারপাশে একটি সবুজ বলয় তৈরী করা যেতে পারে। তাছাড়া, এই ধরণের বলয় বা ঘন উদ্ভিদ আবরণ শব্দ দূষণের জন্য একটি দুর্দান্ত অন্তরায় (Buffer) হিসাবে কাজ করে।

এছাড়া কুল (*Zizyphus mauritiana*), পরশ পিপুল

চিত্র 6: পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ভারী মৌল শোষণে বট (*Ficus benghalensis*) গাছের জুড়ি মেলা ভার।

(*Thespesia populnea*), শিশু (*Dalbergia sissoo*), শিরীষ (*Albizzia lebbeck*), কেন্দু (*Diospyros melanoxylon*), ইত্যাদি গাছ মাটির চরিত্র পুনরুদ্ধারের জন্য প্রধানত পরিত্যক্ত খনি অঞ্চলে, অনুর্বর পতিত জমি, কঠিন শিল্পবর্জ্যের স্তূপ এবং ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত এলাকায় রোপণ করা যেতে পারে। পরে এই পুনরুজ্জীবিত জমিগুলিকে কৃষি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। কারণ এটি সরাসরি আমাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমড়া (*Spondias pinnata*), জাম (*Syzygium cumini*), জিওল (*Lannea coromandelica*), করঞ্জ (*Millettia pinnata*), খেজরি (*Prosopis cineraria*) ইত্যাদি কিছু গাছের সাহায্য নিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ কিছুটা হলেও পরীক্ষা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, গাছপালা আমাদের বাসভূমির পরিবেশের গুণমান অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে পারে। মৌর্য সম্রাট অশোক বৈজ্ঞানিকভাবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের চিন্তাভাবনা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রথম ভারতীয় সম্রাট হিসাবে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তাঁর শিলালিপি পড়ে জানা যায়, তিনি তাঁর রাজত্বকালে বট গাছ (চিত্র 6) লাগানোর উপর জোর দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁর সাম্রাজ্য জুড়ে যত্রতত্র আমের বাগান ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত একটা আক্ষেপ থেকে যায়। প্রাচীন ভারতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে অমূল্য গাছপালা রক্ষা করার সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, আজকের দিনে তা খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। বন ও পরিবেশের নীতি নির্ধারকরা এই ব্যাপারে বেশ উদাসীন। প্রতি বছর সারা দেশে ঘটা করে বনমহোৎসব এবং অন্যান্য বনসৃজন কর্মসূচি পালন করা হয় ঠিকই; কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তার সিকিভাগও দূষণ প্রশমনকারী উদ্ভিদের উপর আরোপ করা হয় না। ●

*লেখক **শ্রী দীপাঞ্জন ঘোষ** বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: dpanjanghosh@gmail.com*

বেঙ্গল বুসলার্ক

তাপস কুমার দত্ত

বিভিন্ন জায়গাতে পাখির ছবি তুলতে গিয়ে যখন কোনো মাঠের মধ্য দিয়ে গেছি তখন কোনো কোনো সময়ে সুরেলা গান গাওয়া এক পাখির দেখা পেয়েছি। সাধারণত আমাদের লোকালয়ে এদের ঘুরতে দেখা যায়না, লোকালয় থেকে একটু দূরে কোনো চাষের ক্ষেত, ফাঁকা মাঠের মধ্যে এদের দেখা পাওয়া যায়। কখনও বিকেলের দিকে দেখেছি ধূলার মধ্যে ডানাকে ঝাঁটকাতে, এই ভাবে এদের ধূলার মধ্যে ধূলা স্নান করতে দেখেছি ,আবার কখনও দেখেছি আকাশে সুরেলা গানের সুরে পাখা মেলে গান করতে, মনে হতো কেউ যেন ওদের সুতোয় ঝুলিয়ে পুতুল নাচের পুতুলের কোনো প্রদর্শনী করছে। যাই হোক আমি এতক্ষন ধরে যে পাখির কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম তা হলো ইংরাজীতে সবাই তাকে বলে থাকে বেঙ্গল বুসলার্ক (Bengal Bushlark), বাংলাতে অনেক নামে এই পাখি পরিচিত। ছবি তুলতে গিয়ে দেখেছি সাধারন স্থানীয় লোকেরা এদেরকে বলতো ঘাস চড়ুই, আবার অনেকে বলে বাংলা ভরত পাখি বা বাংলা ঝাড়ভরত। এই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Mirafra assamica*.

এই পাখিকে দেখতে অনেকটাই চড়াই বা বাবুই পাখির মতো। এদের সাথে পার্থক্য ধরা খুবই মুস্কিল। তবে পার্থক্যতো থাকবেই, যারা পাখি নিয়ে চর্চা করেন তারাই এদের ভালোভাবে সনাক্ত করতে পারবেন। এদের দেখে সনাক্তকরণ তখনই সম্ভব যখন আমরা এদের পা ও লেজের দিকে দৃষ্টি দেবো। কারন এদের পা চড়াই বা বাবুই পাখির তুলনায় অনেকটাই লম্বা হয়ে থাকে এবং এই পাখির লেজের দিকের অংশ অনেকটাই ছোটো। এই পাখি দৈর্ঘ্যে 15–16 সেমি হয় এবং এদের স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে একই রকম তবুও এদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকে তবে আমাদের পক্ষে পার্থক্য ধরা বড়ই কঠিন কাজ। এদের মাথা, ঘাড়, পিঠ ও লেজের অংশ হলুদাভ পাটকেল রঙের উপর কালচে রঙের চওড়া বুটিক থাকে। এদের বুক, পেট ও লেজের তলা হলুদাভ ধূসর রঙের সাথে লালচে রঙের একটা আভা থাকে। ঠোঁট হালকা হলুদ কিন্তু মনে হবে যেন পোড়া মাটির একটা আভা আছে। চোখ লালচে বাদামী রঙের এবং পা ও পায়ের আঙুল হলদেটে বর্ণের হয়।

এদের কিছু কিছু স্বভাব সবাইকেই বেশ অবাক করে দেয়। বিকেল বেলাতে এরা ধূলার মধ্যে বসে এদের পাখনা দুটি ঝটকাতে থাকে। এই দৃশ্য খুবই মনোহর এবং ডানা ঝটকানো অনেকক্ষণ ধরেই চলে, এই ভাবেই এরা ধূলোর মধ্যে স্নান করে এদের দেহকে পরিস্কার করে ফেলে। আবার কখনো কখনো দেখেছি আকাশে দুটি ডানা মেলে একই জায়গাতে থেকে কিছুক্ষণ ধরে এরা সুরেলা স্বরে গান করে এবং অতিদ্রুত জায়গা পরিবর্তন করে অন্য জায়গাতে একই ভাবে তারা সুরেলা স্বরে গান করতে থাকে। এই দৃশ্য যারা একবার দেখবেন তাদের বার বার এই দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করবে। মনে হবে আকাশের অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে কেউ আড়ালে থেকে সুতো দিয়ে তাদেরকে নাচাচ্ছে, অনেকটা যেন সেই পুতুল নাচের ক্রিয়ার মতো। ভারী মনোরম এই দৃশ্য, যারা সামনে থেকে এই পাখির এই কীর্তিকলাপ দেখেছেন তারাই এর বর্ননা ভালো ভাবে করতে পারবেন।

যখন এরা মাঠে ও ক্ষেতে চড়ে বেড়ায় তখন সেখান থেকেই তারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের খাদ্য তালিকার মধ্যে আছে ছোটো পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, ধান, কচি ঘাসের ডগা, ঘাসের দানা ইত্যাদি।

এদের প্রজননের সময় হলো মার্চ মাস থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে। এরা সাধারনত বাসা তৈরী করে ঘাসবন এবং নলবনের কাছাকাছি অঞ্চলে। এই পাখি তাদের বাসা বানাতে গিয়ে যে সমস্ত উপকরন সংগ্রহ করে সেগুলি হলো শুকনো ঘাস ও লতাপাতা,শুকনো ধান গাছের পাতা, খরকুটো ইত্যাদি। প্রজনন কালে এরা তাদের বানানো বাসাতে 2–3টে ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে বাচ্ছা হতে প্রায় 10–13 দিন সময় লেগে যায়। সেই বাচ্ছা পাখি উড়তে শেখে সপ্তাহ দুয়ের মধ্যে।

এই পাখি দেখতে খুব একটা সুন্দর না হলেও এদের সুরেলা আওয়াজ আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে। তাই এই রকমের একটি পাখি আমাদের পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাক এটা আমরা কখনই চাইবো না। তবে এদেরকে পরিবাশে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে পরিবেশের দরকার সেটা বজায় রাখতে হবে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই পরিবেশ বজায় রাখা আমাদের সবার কাছেই বড়ো মুস্কিল। এদের চলাফেরা ও বেঁচে থাকার জন্য জন্য ঘাস যুক্ত বড়ো মাঠ ও তার কাছাকাছি জায়গাতে ধান চাষের জমি অবশ্যই প্রয়োজন। তার সাথে প্রয়োজন ঘাসবন ও নলবন যেখানে এরা বাসা বাঁধে। নগরায়নের জন্য আজ অনেক জমিই হারিয়ে যাচ্ছে। নগরায়নের সাথে সাথে এদের কথাও একবারের জন্য একটু ভাবা প্রয়োজন। ●

লেখক ***শ্রী তাপস কুমার দত্ত*** *বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tapashkumardutta.2012@gmail.com*

চন্ডীতলার ঘাট

আশীষ দাঁ

বেলা পড়তেই শুরু হয় দিনুজেলের বাঁওড়ে ফাঁসজাল পাতা। সঙ্গে নেয় ছোট্ট ডিঙিখানা। সন্ধ্যা নামতেই চন্ডীতলার ঘাটের কাছে বুড়ো শিরিষ গাছে ডিঙাখানা বেঁধে ঘাটে বসে জিরিয়ে নেয়। বাড়ি ফেরে সন্ধ্যা পার করে। চন্ডীতলার প্রাচীন মন্দিরে বহু মানুষজন আসে সন্ধ্যারতি দেখতে। কেউ বা আসে কঙ্কনা বাঁওড়ের হাওয়া খেতে। অনেকে আবার বিকেলে চানও করতে আসে। সক্কলে ওর সাথে দুটো কথা কয়ে বাড়ি ফেরে। কথা কইবে নাইবা কেন। সে হ'ল এ তল্লাটের গেজেট। কার কবে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে, কার বাড়ির গরু খোঁয়াড়ে গেছে, কোন ছেলেমেয়ে কতবার পরীক্ষায় ডিগবাজি খেয়েছে, কোন মহিলা পেত্নীর প্যাঁচে পড়ছে, কার ছাগলজোড়া চুরি গেছে, কে কে এখনও কালাচাঁদ ষাঁড়ের গুঁতো খায় নি ইত্যাদি ইত্যাদি। সব তথ্য তার নখদর্পনে। তবে সে যে তথ্য সংগ্রহে বেশি আগ্রহী, তা হ'ল কোন গৃহে কবে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান বাড়ি মানেই দিনুজেলের রুই-কাতলা। আবার ঘাটে বসে গল্পের ফাঁকে সওদাগরীও হয়ে যায়। কেউ বলে, "গরম ঘি-এর সাথে কড়কড়ে করে ভাঁজা মৌরলা মাছ দারুন" অথবা "শেষ পাতে চাঁদা বা খোলসে মাছের টক লা-জবাব"। ব্যক্তির অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করতে দিনুজেলে সিদ্ধহস্ত। একদিন খগেন জ্যাঠা বলে ওঠেন, "বুঝলি দিনু, বয়স হয়েছে। বাজারে যেতে পারিনে। বেগুন দিয়ে খয়রা মাছের ঝোল,আহা।" ওমনি দিনুজেলে বলে ওঠে, "চিন্তা কর নি। তুমি বেশ ভালোই জানো, দিনু মানে খয়রার খয়রাতি।"

***

পাপান, বাবাই, গোগল, টাইগার, তানিশ। ওরা সবাই খেলার শেষে প্রতিদিন চন্ডীতলার ঘাটে কিছুক্ষণের জন্য এসে বসে। সেদিন চৈত্রের পড়ন্ত বিকেলে ফুরফুরে হাওয়া। বাঁধানো বেঞ্চে শরীর এলিয়ে দিয়ে সবাই গল্পে মশগুল। টাইগার বলতে থাকে, "সামনের সপ্তাহে চড়ক। বঁটির উপর ঝাঁপ, খেজুর ভাঙা দেখতে খুব ভাল লাগে।" কথা গুলো শুনছিল পাশে বসা দিনু। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "এ'বছর গাজন সন্ন্যাসীদের মধ্যে আমিও আছি। তোদের ঐ খেলা আমি দেখাবো।" পাপান আঁতকে উঠল। "সে কী কাকা, এই বয়সে তুমি?" দীনু গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "শোন, age is a number."

— আরে ব্বাস, তুমি ইংরাজিও জানো দেখছি দীনুকাকা?

— কী জানি না আমি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল। সব। আরে নেটিং এ সব জানা যায়।

— নেটিং? নেটিং মানে তো জাল বোনা?

— ওরে বাবা গুগলির কথা বলছি, গুগলি।

— গেঁড়ি গুগলি তো জলে থাকে।

— তোদের অ্যান্টেনায় বুস্টার লাগাতে হবে। বুইছিস?

টাইগার বুঝতে পেরে বলে, "তোরা বুঝছিস না? দীনুকাকা গুগল সার্চের কথা বলছে। নেটিং মানে ইন্টারনেট।" হাসির রোল ধীরে ধীরে বাঁওড়ের জলে লীন হয়ে গেল। গোগল বলে উঠল, "আচ্ছা দিনুকাকা, তুমি তো অনেক কথা জানো। ঘাটের পাশে ঐ শিরিষ গাছটার বয়স কত হবে?"

— প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। চন্ডীতলার পাশেই চক্রবর্তীনাচে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। নাম ছিল তাঁর হরিহর চক্রবর্তী। সে এই মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। তিনি নেচে নেচে পুজো করতেন বলে ঐ অঞ্চলের নাম হ'ল চক্রবর্তীনাচ। এখন ওখানে যে দুর্গাপুজো হয়, সেই পুজো তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত। তাঁর স্ত্রীও খুব পুজো আচ্চা করতেন। তাঁর ছিল বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ। সাপে কেটে মারা যায়। অপমৃত্যু। ঐ শিরিষ গাছের তলায় গিন্নিমাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে বোঝ, গাছাখানা কবেকার।

***

বিশু কলেজে পড়ে। বিজ্ঞান নিয়ে। প্রথম বর্ষের ছাত্র। বিজ্ঞানের জটিল কিছু বুঝতে পাপান, গোগলরা বিশুর কাছে চলে আসে। বিশু বয়সে বড় হলেও বন্ধুত্বে কোন সীমারেখা টানে নি। আগামী পরশু চড়ক। দু'দিন ওরা খেলতে পারবে না। তাই আজ চন্ডীতলার মাঠে চলছে জোর কদমে ডাংগুলি খেলা। শেষ দানে খেলতে নামে বিশু। ছোট্ট লম্বাটে গর্তের উপর প্রায় দু'ইঞ্চির গুলিটাকে বসিয়ে দেড় ফুটের ডান্ডা দিয়ে দূরে ছুড়ল। কেউ লুফতে পারল না। বিশু ডান্ডাটা গর্তের কাছে লম্বালম্বি রাখল। গোগল গুলি ছোড়ে ডান্ডাকে তাক করে। গুলি-ডান্ডায় সংযোগ না হওয়াতে বিশু আউট হওয়া থেকে বেঁচে যায়। সবাই

ঘিরে আছে বিশুকে। যাতে গুলির ছুঁচালো দিকে ডান্ডা দিয়ে বাড়ি মারতেই ওরা গুলিটাকে লুফে নিয়ে আউট করতে পারে। ক্রমশ অন্ধকার ঘিরে নিচ্ছে মাঠকে। বিশু একটা ফন্দি আঁটে।

— শোন, তোরা তো জানিস আমি গুলি তুলে মারতে মারতে এগোতে থাকি। দিনুকাকার কাছে শুনেছি সন্ধ্যার সময় ঐ শিরিষ গাছে নাকি শাকচুন্নীর আওয়াজ শোনা যায়। লোকে বলে হরিহর চক্রবর্তীর বৌ এর আওয়াজ। গুলি পেটানোর সময় গুলি কিন্তু ঐ দিকে চলে যেতে পারে। দেখ, তোরা কী করবি?

ভয় পেয়ে সবাই সরে গেল। গোগল ওদের মধ্য সাহসী। ও বলে উঠল, "আমার ভূতের ভয় নেই। তুমি খেল। আমি ক্যাচ ধরার চেষ্টা করবই।" বিশু গুলি তুলে সপাটে মার। গিয়ে পড়ল শিরিষ গাছের গোড়ায়। সবার মাথায় হাত। বিশু এবার বলে, "নে ডান্ডা দিয়ে গাছের গোড়া থেকে মাপতে থাক।" ভয়ে কেউ আর এগালো না। গোগল বলে, "ঠিক আছে কাল সকালে মাপবো।"

— কেন? তুই যে বললি তোর ভূতের ভয় নেই।

— নেই তো। অন্ধকারে গুলি খুঁজে পাবে?

— আমি কাল সকালে কোলকাতায় যাবো। যা করার আজই কর।

— ঠিক আছে। বাড়ি থেকে টর্চ নিয়ে আসছি।

সবাই বলল, একবার বাড়ি গেলে আর আসতে দেবে না তোকে। বিশু বলল, "ঠিক আছে তোরা বস। আমি টর্চ নিয়ে আসছি।" এই বলে এক দৌড়ে বাড়ি চলে যায় বিশু। ফিরে এসে বলে, "চল গুলিটা খুঁজি।" সবাই ভয়ে পেয়ে বলল, "আমরা ঘাটে বসে আছি। গোগল তোমার সাথে যাবে।" গোগল চলেছে বিশুর সাথে। বিশু ভয় দেখানোর জন্য গল্প বলতে থাকে।

— দিনুকাকার কাছে শুনেছি, হরিহর চক্রবর্তীর বৌকে নাকি মাঝেমধ্যে ফিসফিস করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে দেখা যায়। এক পূর্ণিমার রাতে দিনুকাকা দেখেছে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে।

— বিশুদা,ভূত বলে কিছু হয় না।

— আমিও তাই মনে করি। তুই একটু দাঁড়া। আমি ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে গুলিটাকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করি। মনে মনে বলে, ভয় পাবি নি মানে। দেখাচ্ছি মজা। দু'মিনিট পরে বিশু দৌড়ে ফিরে আসে।

— গোগল, শুনতে পাচ্ছিস একটা ফিসফিসানি?

বলতে বলতে সাদা একটা মেঘের মত কিছু গাছের দিকে উঠে গেল।

— ঐ দ্যাখ সাদা থান কাপড় পড়ে গাছের ডালে ঠ্যাঙ দোলাচ্ছে।

গোগল ঐ দিকে তাকাতেই দে দৌড় ঘাটের দিকে। এসেই শুয়ে পড়ল। সবাই বলে ওঠে, "কী হয়েছে রে? " ওর মুখে কোন কথা নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে। ততক্ষণে বিশু পৌছে গেছে ঘাটে। ও গোগলের চোখেমুখে জল ছিটাতেই গোগলের সম্বিত ফিরে আসে। চাউনিতে আতঙ্কের ছাপ। তানিস চেঁচাতে থাকে, "কী হয়েছে রে গোগল? ভয় পাচ্ছিস কেন?" গোগলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "শাকচুন্নী। শাকচুন্নীর মন্ত্রোচ্চারণ।" এবার বিশু বলতে থাকে।

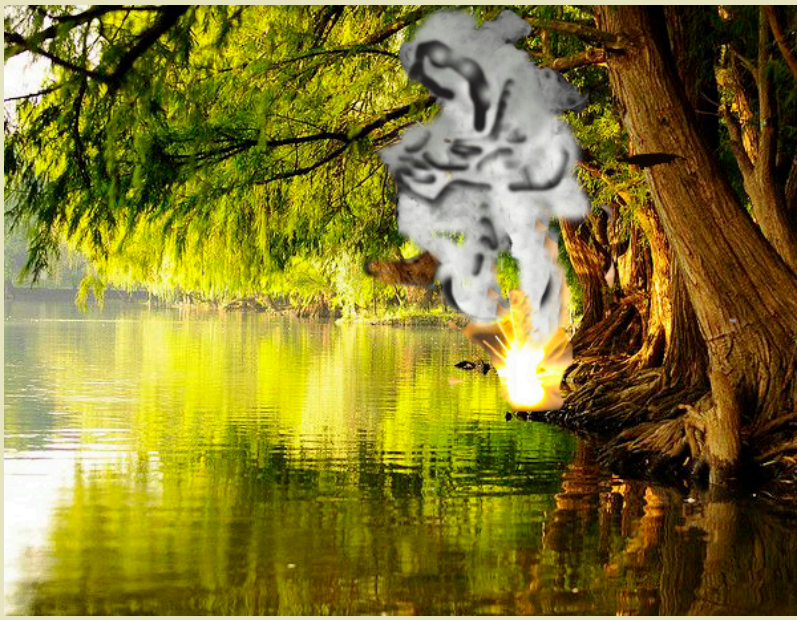

— হ্যাঁ, গোগল ঠিক বলেছে। ভূত-প্রেত বলে কিছু হয় না। আমি যখন ব্যাগ থেকে টর্চ বের করি, সেই সাথে টিনের কৌটতে কেরোসিন তেলের মধ্যে রাখা সোডিয়াম মেটালের একটা বড় খন্ড বের করে জলে ফেলে দিই। গোগল যাতে এটা দেখতে না পায়, তার জন্য ওকে গাছের গোড়ায় আসতে বারণ করি। সোডিয়াম মেটাল জলে পড়তেই রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়। সেই সাথে বুড়বুড় শব্দ হতে থাকে। আসার সময় ওকে শুনিয়েছি যে, ঐ গাছে হরিহর চক্রবর্তীর বৌ এর প্রেতাত্মাকে দেখা যায়। ফিসফিসানি শোনা যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার শব্দকে শাকচুন্নীর মন্ত্রোচ্চারণ বলে চালিয়ে দিই। আর যেহেতু সোডিয়াম মেটালের টুকরোটা বড় ছিল, দু-তিন মিনিট পর আগুন জ্বলে ওঠে। সেই সাথে ধোঁয়া গাছের দিকে উঠে যায়। গোগলের দৃষ্টিভ্রম হয়। সাদা ধোঁয়াকে ও থান কাপড় ভাবে। গতকাল কালবৈশাখীতে একটা শুকনো ডাল গাছে ঝুলছিল। সেটাকে ঠ্যাঙ বলে ওকে ভুল বোঝাই। মনেমনে ভয় দেখানোর মতলব ছিল। আজ সুযোগ এসে গেল। তবে এটা কিন্তু বিজ্ঞানের ভেল্কি।

তানিশ বলে ওঠে, "তাই বলে এভাবে ভয় দেখাবে? ওর যদি কিছু হয়ে যেত?"

টাইগার এবার জিজ্ঞেস করে উঠল, "আচ্ছা বিশুদা, কেরোসিনের মধ্য সোডিয়াম মেটাল চুবিয়ে রেখেছিলে কেন?"

— খোলা বাতাসে রাখলে জলীয়বাস্পের সাথে বিক্রিয়া হবে। তাতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কেরোসিনে রাখলে বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারবে না।

বিশু গোগলকে কাঁধে চড়িয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে। গোগলের মুখে তখন হাসি। সকলে হাসতে হাসতে পিছন পিছন চলতে থাকে। ●

লেখক ***শ্রী আশীষ দাঁ*** *বিজ্ঞানের স্নাতক, বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মী এবং বর্তমানে PRISM এর সদস্য।*
ইমেল: ashis.dawn@gmail.com

ছায়াপথের জ্যোতির্মন্ডল

তন্ময় ধর

স্থূল দ্রব্যময়ী পৃথিবীর বাইরে যেমন সূক্ষ্ম বায়ুমন্ডলের আবরণ তার উদ্বৃত্ত ভাগের প্রহরীর মত রয়েছে, ঠিক তেমনই গ্যালাক্সির ঘূর্ণনতলের বাইরে বৃদ্ধ তারকা এবং বর্তুলাকার নক্ষত্রস্তবকেরা তৈরি করেছে তার জ্যোতির্মন্ডল। এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ওই অংশে প্রায় 158টি বর্তুলাকার নক্ষত্রস্তবক (Globular cluster) রয়েছে। বর্তুলাকার নক্ষত্রস্তবকগুলি সাধারণত কয়েক লক্ষ বৃদ্ধ তারকার সমন্বয়ে তৈরি হয়। নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত ঘনসন্নিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ওদের কেন্দ্রীয় অংশে একটি নক্ষত্র থেকে নিকটবর্তী নক্ষত্রটির দূরত্ব গ্যালাক্সির সাধারণ অংশে থাকা দু'টি নক্ষত্রের পারস্পরিক দূরত্বের 12000 ভাগের 1 ভাগ প্রায়। নক্ষত্রস্তবকগুলি যে কক্ষপথে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে তা অতি দীর্ঘ—প্রায় 130000 আলোকবর্ষ দীর্ঘ। গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রায় 200000 আলোকবর্ষ দূরেও পাল 4 (PAL 4) এবং এএম 1 (AM 1) নামক বর্তুলাকার তারকাস্তবক পাওয়া গিয়েছে। চমকপ্রদ ব্যপার হল বিশালাকার বর্তুলাকার স্তবকগুলির প্রায় 40 শতাংশই আকাশগঙ্গার আবর্তনবেগের উলটো অভিমুখে ঘুরছে। এই রহস্য তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের ভাবাচ্ছে। সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক স্লোয়ান ডিজিট্যাল আকাশ বীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতির্মন্ডলের মধ্যে এক রহস্যময় নক্ষত্রস্রোতের সন্ধান পেয়েছেন। কন্যারাশির অভিমুখে ধাবমান ওই স্রোত আকাশগঙ্গা এবং নিকটবর্তী কোন বামন গ্যালাক্সির সংঘাত জাত। জ্যোতির্মন্ডলের মধ্যেই নিকটবর্তী আরো তিনটি গ্যালাক্সি (ধনুরাশির বামন, বৃহৎ কুকুরমন্ডলীয় বামন এবং সপ্তর্ষিমন্ডলীয় বামন গ্যালাক্সি) বর্তমানে সংঘাতরত।

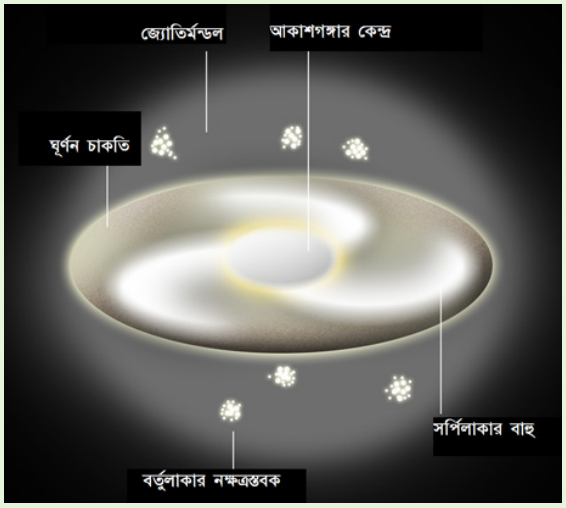

কিন্তু এই দৃশ্যমান জ্যোতির্মন্ডলই শেষ কথা নয়। এর বাইরে রয়েছে কৃষ্ণবস্তু বা ডার্ক ম্যাটারে তৈরি অদৃশ্য জ্যোতির্মন্ডল। এই কৃষ্ণবস্তুর স্বরূপ, প্রকৃতি—সব কিছুই বিজ্ঞানীদের অজানা। কিন্তু কৃষ্ণবস্তু যে প্রচুর পরিমাণে আছে এবং তা যে অন্যান্য জ্ঞাত বস্তুর চেয়ে অনেক শক্তিশালী, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। অদৃশ্য জ্যোতির্মন্ডল গ্যালাক্সির চতুর্দিকে প্রায় 325000 আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নক্ষত্রে তৈরি জ্যোতির্মন্ডলের প্রকৃতি এবং সঠিক বিস্তৃতি নিয়ে সংশয় যতটা রয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী সংশয় রয়েছে গ্যাসীয় জ্যোতির্মন্ডলের বিস্তৃতি নিয়ে। আকাশগঙ্গার চতুর্দিকে প্রায় 300000 আলোকবর্ষ ছড়িয়ে রয়েছে এটি। নাসার চন্দ্র এক্স-রশ্মি টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গিয়েছে জ্যোতির্মন্ডলের গ্যাসের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী—প্রায় 10 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ কেলভিন।

নাক্ষত্রিক যে জ্যোতির্মণ্ডল তার উৎপত্তি স্বাভাবিকভাবেই মহাবিশ্বের একটি কোল্ড ডার্ক ম্যাটার মডেল অনুসারী যেখানে জ্যোতির্মন্ডলের মতো সিস্টেমের বিবর্তন স্বাভাবিকভাবে উর্ধ্বমুখী, যার অর্থ ছোট বস্তু দিয়ে শুরু করে ছায়াপথের মত বৃহৎ আকারের গঠন নির্মিত হয়। ব্যারিওনিক এবং ডার্ক ম্যাটার উভয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে একে অপরের সাথে একত্রিত হয়ে এই জ্যোতির্মন্ডল তৈরি হয়। আবার বিভিন্ন প্রমাণ বলছে যে, গ্যালাক্টিক হ্যালোর গঠন বর্ধিত মাধ্যাকর্ষণ এবং আদিম ব্ল্যাক হোলের উপস্থিতির কারণেও হতে পারে। আবার অন্য মত বলছে, ছায়াপথের জ্যোতির্মন্ডল 'গাইয়া সসেজ' থেকে উদ্ভূত। গাইয়া সসেজ হল সুদূর অতীতে, প্রায় 800 কোটি থেকে 1100 কোটি বছর আগে, ছায়াপথের সঙ্গে এক বা একাধিক বামন গ্যালাক্সির সংঘাতসঞ্জাত অবশেষ।

সাধারণত, একটি গ্যালাক্সির নাক্ষত্রিক ভরের মাত্র 1% তার জ্যোতির্মণ্ডলে থাকে। কম আলোর কারণে, অন্যান্য ছায়াপথগুলিতে জ্যোতির্মন্ডল পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন। জ্যোতির্মন্ডলে সাধারণত কোন নেট ঘূর্ণন থাকে না এবং এটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বেগ বিচ্ছুরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। সে কারণে পরোক্ষভাবে এর বেগ পরিমাপ করে চরিত্র বোঝাও মুশকিল। ছায়াপথের জ্যোতির্মন্ডলের নক্ষত্রগুলি সাধারণত বৃদ্ধ নক্ষত্র, বেশিরভাগের বয়স 1200 কোটি বছরের বেশি। অর্থাৎ এরা গ্যালাক্সির প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত নক্ষত্র, পরে কোন কারণে তাদের আদিম ঘর অর্থাৎ গ্যালাক্সির ঘূর্ণন চাকতি থেকে বিচ্যুত হয়ে জ্যোতির্মন্ডলে ঠাঁই পেয়েছে। কাজেই ছায়াপথেরর বিবর্তনীয় ইতিহাসকে উন্মোচন করার জন্য এই নক্ষত্রগুলির চর্চা অত্যন্ত জরুরি। রাসায়নিকভাবে দেখলে, জ্যোতির্মন্ডলের নক্ষত্রগুলি সাধারণত ধাতু উপাদানের নিরিখে অত্যন্ত দরিদ্র। সর্বোচ্চ মান সৌর মানের প্রায় 1/30। আর সর্বনিম্ন মান হল সৌর মানের আনুমানিক 1/200000। জ্যোতির্মণ্ডলের রাসায়নিক প্রকৃতিও ছায়াপথের সৃষ্টি রহস্যে অনেক অজানা দুয়ার খুলে দিতে পারে।

*লেখক **শ্রী তন্ময় ধর** বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: tstorm.tanmay@gmail.com*

দেখার তারতম্য

দিগন্ত পাল

কখনও ভেবে দেখেছেন যে মাছি কেন এত দ্রুত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে উড়ে বেড়ায়? কাঠবেড়ালী কেন এত ছটফটে ? ছোট্ট চড়ুই, কুকুরছানা, বিড়ালছানা, এমনকি মানবশিশুরা এত চঞ্চল কেন? প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা সাধারণত অনেকটাই ধীর-স্থির। কিন্তু সমুদ্রের অতিকায় লেদ্যারব্যাক্ কচ্ছপেরা আরও বেশী ধীর গতিতে চলাফেরা করে কেন? বস্তুত এই বিষয়টি নির্ভর করে প্রাণীদেহের বিপাক ক্রিয়ার হারের উপর। আবার ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন-র গবেষকেরা তিরিশেরও বেশী সংখ্যক স্পিসিস-র প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রাণীদেহে যে বিপাক ক্রিয়া চলে তার হারের সাথে যদি প্রাণীটির দেহের আকারকেও বিবেচনা করা হয়, তবে সেগুলির সাথে প্রাণীটির মস্তিষ্ক দৃষ্টিলব্ধ সময়গত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যে সময় নেয় তার একটা সরল সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাণীদেহে যে বিপাক ক্রিয়া চলে তার হারের সাথে যদি প্রাণীটির দেহের আকারকেও বিবেচনা করা হয়, তবে সেগুলির সাথে প্রাণীটির মস্তিষ্ক দৃষ্টিলব্ধ সময়গত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যে সময় নেয় তার একটা সরল সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের দৃষ্টিলব্ধ সময়গত তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সর্বাধিক 100 ফ্রেম্স প্রতি সেকেন্ড। মস্তিষ্কের দৃষ্টিলব্ধ সময়গত তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অথবা সহজ করে বললে, মস্তিষ্কের কোনো চলচ্ছবি বোঝার ক্ষমতাকে “ফ্রেম রেট” বলে। পরীক্ষালব্ধ ফল বলছে—মাছির দেহের বিপাক ক্রিয়ার হার প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপেক্ষা বেশী হওয়ায় মাছির গতিবিধি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী ত্বরিত তো বটেই, মাছি আকারেও অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট হওয়ায় মাছির মস্তিষ্ক তাকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চার গুণেরও বেশী ফ্রেম রেট-এ দেখতে সাহায্য করে। অন্যভাবে বললে; মাছি সকল জীব, জড়, ও জগৎকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপেক্ষা চার গুণেরও বেশী স্লো মোশন্-এ দেখে—হাই স্পিড ক্যামেরা-য় কোন ফুটেজ-কে ঠিক যেমনটি দেখায়!

ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরাও সাধারণত খুব চঞ্চল হয়। তাদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা যেতেই পারে, কিন্তু তাদের এই চঞ্চল স্বভাবের খুব বেশী বিরুদ্ধাচরণ করা ঠিক নয় কারণ প্রকৃতিই তাদেরকে এই চঞ্চল স্বভাব দান করে। তারা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের দেহের আকার যেমন বড় হয়, তাদের দেহের বিপাক ক্রিয়ার হারও কমতে থাকে। ফলে জগৎকে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় স্লো মোশন্-এ দেখার স্বভাব ও তাদের এই চাঞ্চল্য উভয়ই একটা বয়সের পরে নিজে থেকেই বিদায় নেয়।

আবার লেদ্যারব্যাক্ কচ্ছপের বিপাক ক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপেক্ষা অনেক কম হারে ঘটে বলে লেদ্যারব্যাক্ কচ্ছপের গতিবিধি যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করতে বসেন, কিছুক্ষণ পরই আপনার ঘুম পেয়ে যাবে ! এছাড়াও এদের চেহারা বিশাল বলে এদের মস্তিষ্কের যে অংশটি দৃষ্টিলব্ধ সময়গত তথ্যের বিশ্লেষণ করে সেটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রায় এক চতুর্থাংশ ফ্রেম রেট-এ এই জগৎকে দেখতে সাহায্য করে। ফলস্বরূপ এই প্রাণীটি চারপাশের জগৎকে দেখে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী ফাস্ট মোশন্-এ! ●

*লেখক **শ্রী দিগন্ত পাল** বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞান কর্মী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: digantapaul5@gmail.com*

ফাস্ট মোশন দৃশ্য

স্লো মোশন দৃশ্য

বেদান্ত দর্শনের পটভূমিতে আয়ুর্বেদ

সুজয় পাল

ঔষধশাস্ত্রের ইতিহাস মানব সভ্যতার এক অন্যতম অভিব্যক্তির মান সূচক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান বা "বেদ", যা মানুষের জীবনীশক্তি বা "আয়ু" বর্ধন করে তাকে আমরা "আয়ুর্বেদ" নামে চিহ্নিত করেছি। সৃষ্টির প্রাক লগ্নে আয়ুর্বেদ একটি মৌখিক রীতি হিসেবে উদ্ভব হয়েছিল। আয়ুর্বেদের প্রথম নথিবদ্ধ শ্লোকের আকার বিবর্তিত হয় বেদ থেকে। প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব 6000 অব্দে যযুর্বেদ সংহিতাতে; মূলত তৈত্তিরীয় উপনিষদের বিশেষ কিছু স্তোমসমূহকে আয়ুর্বেদের পরোক্ষ উৎস হিসাবে ধরা হয়, ক্রমে তার পুর্ণ বিকাশ লাভ করে অথর্ববেদে। সেই অর্থে বৈদিক পরম্পরায় আয়ুর্বেদ হচ্ছে একটি উপবেদ (সহায়ক জ্ঞান)। পর্যায় কালে খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ হতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই নির্মিতির ভেষজ তত্ত্বগুণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত প্রতুল বিকাশ ঘটেছিল এবং এটি "সংহিতা" নামে আখ্যায়িত হয়। সেই সুবর্ণ সময়ে অনেকগুলি ধ্রুপদী রচনার সৃষ্টি হয়েছিল যার সময়কাল ও সংগঠিত চিকিৎসা প্রণালী গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা অনন্যতম। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বৃহৎত্রয়ীর এই উক্ত দুই গ্রন্থের সুষম বিন্যাস করেছিলেন ভগভট্ট তাঁর অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতাতে যাকে বৃহৎত্রয়ীর সর্বশেষ সঙ্কলনের মান্যতা দেওয়া হয়।

সভ্যতার অগ্রগতি এবং রোগলক্ষন পরিবর্তনের সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানও পরিবর্তণশীল, আয়ুর্বেদ ভারতে একটি যুক্তিসঙ্গত যৌক্তিক দর্শন ভিত্তির সাথে বিকশিত হয়েছে এবং স্বতন্ত্র সত্তাতে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্থিত। এই দর্শন মূলত স্থুলশরীর (দেহ) ও সূক্ষ্ম শরীর (মন) কেন্দ্রীক, ভারতীয় চিন্তাধারায় খ্রীষ্টপূর্ব 4র্থ থেকে 1ম শতাব্দীর প্রথম দিকে তৈত্তিরীয় উপনিষদ পঞ্চকোষ বর্ণনা করে যা আত্মার আধার স্বরূপ।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধির্ আনন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোষাস্তৈরাবৃত্তঃ স্বাত্মা, বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥

পঞ্চদোষী (১.৩৩)

পঞ্চদোষী (১.৩৩ শ্লোক) অনুযায়ী মানব শরীর নির্দিষ্ট স্তর বা আবরণ দ্বারা সংগঠিত, সবচেয়ে বাইরের আবরণ হল অন্নময় কোষ বা ভৌত দেহ, যা আমাদের খাদ্যগ্রহণ দ্বারা স্থিত ও পুষ্ট হয়। পরবর্তী ভৌত দেহের অভ্যন্তরীণ স্তর হল প্রাণময় কোষ বা অত্যাবশ্যক দেহ, যা পানীয় জল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণশীল। অত্যাবশ্যকীয় মানসিক দেহ যাকে মনোময় কোষ বলা হয়, এটি প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার সূক্ষ্ম উপাদানগুলি দ্বারা পুষ্ট হয়। মনের অভ্যন্তরীণ হল বুদ্ধি বা উপলব্ধি, চিন্তার অত্যন্ত বিশুদ্ধ রূপ এর নাম বিজ্ঞানময় কোষ যা ধর্মস্তিতধী। হিতপদেশে এইরূপ উক্তি করা হচ্ছে যে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারটি কর্ম মানুষ ও পশুর মধ্যে সমানভাবে বর্তমান। কিন্তু মানুষের অধিকতর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা পারমার্থিক অনুশীলনে নিযুক্ত হতে সক্ষম। অতএব পারমার্থিক জীবন ছাড়া মানুষ পশুর সমান, এই চিন্তন শীলতাই বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান।

আয়ুর্বেদের পঞ্চকোষ দর্শনের চিত্র বিন্যাস

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনম চ সমানমেতৎপশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

(হিতোপদেশ)

বুদ্ধির অভ্যন্তরীণ হল শেষ কোষ, যাকে কার্যকারক দেহ বলা হয়—যার মাধ্যমে সুসুপ্তাবস্থাতে আমরা এক ধরণের আনন্দ অনুভব করি তা হল আনন্দময় কোষ, এই কোষ ই আত্মার আধার।

বৈদিক পূর্ণতত্ত্ববাদ আত্মাস্বরূপ মহাজাগতিক উপলব্ধিকে সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করেছে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী প্রথম অনুবাকের প্রথম শ্লোকের মাধ্যমে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা যেতে পারে স্বয়ং আত্মারূপ পরমাত্মা যা অন্তরীক্ষে বিলীয়মান, তা ক্রমান্বয়ে আকাশ-বায়ু-অগ্নি-অপ-ভূমি এই পঞ্চমহাভুতের মাধ্যমে ওষধিতে বর্তায় যা খাদ্য রূপে মানুষ কে পোষণ করে।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমভূতঃ।
আকাশাদ্বায়ুঃ। বাযোরগ্নিঃ। অগ্নেরাপহঃ।
অদ্ভ্যঃপৃথিবী।পৃথিব্যা ওষধইয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাত্পুরুষঃ॥

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্থুলশরীর অত্যজ্য খাদ্যের অপরিহার্য পদার্থ দিয়ে সংগঠিত। আয়ুর্বেদের এই পঞ্চতত্ত্ব বাদ বহু ভাবে বিশ্লেষিত যা দৈহিক কৃঞ্জল সাধন করে, তাই এগুলিকে 'মূল সিদ্ধান্ত' বা 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল তত্ত্ব' বলা হয়। দেহ ও মনের ভারসাম্যতাই সুস্থতা যা এই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট তিনটি 'দোষ' বা মৌলিক বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত। 'দোষ' এর তিনটি মৌলিক উপাদান হল "বাতঃ" (আকাশ ও বায়ু), "পিত্তঃ" (অগ্নি

ও জল) এবং "কফঃ" (জল ও ভূমি), যেগুলি সব একসাথে শরীরের উপচিতি ও অপচিতি রাসায়নিক বিক্রিয়া সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনটি দোষগুলির প্রধান কাজ হল শরীরে পাচিত পুষ্টির উপজাত দ্রব্য শরীরের সমস্ত স্থানে পৌঁছে সপ্ত ধাতুর (রস-রক্ত-মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র) পোষণ করে কোষ পেশী ইত্যাদি তৈরীতে সাহায্য করা। এই দোষগুলির ভারসাম্যের গোলযোগ হলেই তা রোগের কারণ হয়। শরীরের অন্তর্নিহিত বা বাহ্যিক বিভিন্ন কারণের জন্য এই প্রয়োজনীয় ভারসাম্যে তারতম্য আসতে পারে যার ফলে অসুখ করে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী দশম অনুবাকের পঞ্চম শ্লোক খাদ্য বা অন্নের এক অপরিহার্য তত্ত্ব উপস্থাপনা করা হয়েছে, সৃষ্টির আদি রুপ ওষধি বা গুল্ম-বিরুৎ উদ্ভিদ যা মানুষ ও দেবতা সৃষ্টির প্রথমে জন্মায় সে ই অন্ন রূপে পোষণ করে। যিনি অন্ন দান করেন তিনি সত্যের দ্বারা রক্ষিত হন, কিন্তু যিনি অন্ন সঞ্চয় করেন অন্ন তাকে অন্নরূপেই ভক্ষণ করে। এই ঋতঋক যেন অতিরিক্ত ভক্ষণের বিরূপ এবং প্রমান করে ভক্ষিত ওষধি, ঔষধি রূপে শরীর সংরক্ষন করে।

অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্।
অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ।
অহং শ্লোককৃত্ অহং শ্লোককৃত্।
অহম্ ঋতস্য প্রথমজাঃ দেবেভ্যঃ পূর্বম্।
অমৃতস্য না ভায়ি চ অস্মি। যঃ মা দদাতি সঃ ইত্ এব মা অবাঃ।
অহম্ অন্নম্ অন্নম্ অদন্তম্ অদ্মি।

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ)

আয়ুর্বেদ দর্শনের শেষ ভাগে বিভিন্ন "যোগ" এর উল্লেখ মেলে, এদের মধ্যে পতঞ্জলি যোগ সূত্রাবলী অনন্য। সূক্ষ্ম শরীরে সর্বমোট সাতটি কেন্দ্রবিন্দু বা চক্র (মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মনিপুর-অনাহত-বিশুদ্ধা-আজ্ঞা-সহস্রার) উপস্থিত, যারা ইরা, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক তিনটি "নাদী" বা "নাড়ী" দ্বারা যুক্ত থেকে দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করে। অথর্ববেদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন যোগ উপনিষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল শাণ্ডিল্য উপনিষদ, যা "অষ্টাঙ্গ যোগ" (যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহরণ-ধারণ-ধ্যান-সমাধি) সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভাবে ব্যখ্যায়িত। যে বায়ু তত্ত্ব শরীরে অবস্থান করে তা পঞ্চপ্রাণ বায়ু (প্রাণ, অপান, উদান, সমান এবং ব্যান) নামে আখ্যায়িত ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রনের মাত্রাই "প্রাণায়াম", হঠযোগপ্রদীপিকাতে বলা হয়েছে—যতক্ষণ শরীরে বায়ু আছে ততক্ষণ জীবন আছে। বায়ুর নিষ্ক্রমণই মৃত্যু। এজন্য বায়ুকে নিরোধ করা দরকার।

"যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবনমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিঃ ততো বায়ুং নিরোধযেৎ॥

(হঠযোগপ্রদীপিকা)

এই সূক্ষ্ম শ্বাস বহন কারি প্রাণ বায়ু; শ্বাস-প্রশ্বাস এবং অন্যান্য যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে, একজন অনুশীলনকারীকে অতিসাধারণ শক্তি ও নীরোগ শরীর প্রদান করে। প্রকৃত চিকিৎসা হল সঠিক খাদ্য, সু-জীবনযাত্রা ও স্বভাবের উন্নতির দ্বারা শরীর ও মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা, ঔষধ গ্রহণ, নিরাময় পঞ্চকর্ম এবং রসায়ন চিকিৎসা দ্বারা রোগ সমূহ নাশ করা। সঠিক খাদ্যাভ্যাস এতটাই গুরুত্বপুর্ণ যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্মৃতিপ্রস্থান স্বরূপ তাতেই ব্রহ্ম আরোপিত করা হয়েছে।

অহম্ বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫.১৪)

লেখক ***ডঃ সুজয় পাল*** *রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও ভেষজ মৌলতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণারত। ইমেল: Rkmvccollege@rkmvccrahara.org*

বাস্তুতন্ত্রের বিস্ময়

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

ব্রুম হেয়ার খরগোশ

তুলতুলে ফুরফুরে ওরে বাবা খরগোশ
কেন ঘাস পাতা খাস তুই ঐ বনে বাদাড়ে
বল দেখি রোজ রোজ
আহারে!

অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের স্বনামধন্য এই মিষ্টি দেখতে প্রাণীটি আমাদের পরিবেশের মধ্যস্থিত সবুজ কচি ঘাস, পাতা, ফল-মূল প্রভৃতি খেয়ে জীবনধারণ করে; বাস্তুতন্ত্রকে সচল রাখতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে খাদ্য শৃঙ্খলের নিম্নস্তরের সদস্য এই প্রাণীটি। খরগোশ কুকুর, শেয়াল, হায়েনা প্রভৃতি প্রাণীদের খাবার। এদেরকে আবার বাঘ ও সিংহে খায়; এভাবেই খাদ্য শৃঙ্খলের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে পুষ্টির আদানপ্রদান সম্ভব হয়। এখন যদি এই শৃঙ্খলের কোন এক স্তরের সদস্য সংখ্যা কমে যায় বা না থাকে তাহলে খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়বে অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র দারুন ভাবে বিঘ্নিত হবে; পরিবেশের চরম ক্ষতিসাধন হবে। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো বর্তমানে "ব্রুম হেয়ার" প্রজাতির খরগোশের অস্তিত্ব ঝুঁকিপূর্ণ, সাথে সাথেই বাকি অন্যান্য আরও প্রজাতির সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়!

"ব্রুম হেয়ার" প্রজাতির খরগোশেরা দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ মহাদেশের উত্তর স্পেনের স্থানীয়। এদেরকে উত্তর-পশ্চিম স্পেনের 'দ্য সিয়েরা ডে পেনা ল্যাব্রা' ও 'দ্য সিয়েরা ডে অ্যানকেয়ার্স' পর্বতমালার মধ্যবর্তী ক্যান্টাব্রিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই এলাকা টি পূর্ব-পশ্চিমে 230 কিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে 25–40 কিলোমিটার বিস্তৃত। এই নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ ব্রুম হেয়ার প্রজাতির খরগোশেরা সচরাচর প্রায় 6600 ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে গুল্মজাতীয় তৃণভূমিতে এরিকা, ক্যালুনা, ভ্যাকসিনিয়াম, সাইটিসাস, জেনিস্টা ও জুনিপেরাস নামক সপুষ্পক গুল্মের আড়ালে বসবাস করে। তবে অনেকেই আবার ওক ও বীচ গাছের পর্ণমোচী অরণ্যেও থাকতে পছন্দ করে।

অ্যানিমালিয়া (প্রাণী) রাজ্যের, কর্ডাটা (মেরুদন্ডী) পর্বের, ম্যামেলিয়া (স্তন্যপায়ী) শ্রেণীর, ল্যাগোমার্ফা ক্রমের, ল্যাপোরিডা পরিবারের ও লেপুস গণের অন্তর্ভুক্ত এই বিশেষ প্রজাতির খরগোশটিকে 1976 সালে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। এই ব্রুম হেয়ার প্রজাতির খরগোশের বিজ্ঞান সম্মত নাম হলো "*লেপুস ক্যাস্ট্রোভেইজোই*"। এদের দেহের লম্বা প্রায় 45–65 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় 5–10 সেন্টিমিটার। সামনের পায়ের দৈর্ঘ্য প্রায় 10–20 সেন্টিমিটার, সেই তুলনায় পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্য প্রায় 20–30 সেন্টিমিটার; এই বিশেষ তারতম্যের কারণে এই জাতীয় খরগোশ অত্যন্ত দ্রুত দৌড়াতে পারে। কানও তুলনামূলকভাবে খুব বড়ো, প্রায় 18–20 সেন্টিমিটার; এর সাহায্যে ওরা শরীরের তাপমাত্রা কমাতে পারে ও নিজেকে ঠান্ডা রাখে। দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়, এমনকি মাথার উপর দিয়ে পিছনের বস্তুকেও চিনতে পারে। রাতের বেলায় এরা খুব বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে, এদের সারা দেহ বাদামি ও কালো রঙের লোমে ঢাকা থাকে, খুব সামান্য সাদা সাদা ফোটা দেখা যায় এদের উপরিভাগে। শরীরের নিচের দিক পুরোটাই সাদা রঙের হয়। লেজের উপরের দিক কালো ও নীচের দিক সাদা এবং কান বাদামি ধূসর রঙের কালো কালো ছোপযুক্ত হয়। সার্বিকভাবে দেখতে খুবই আকর্ষণীয়।

1758 সালে সুইডেনের প্রাণীবিদ কার্ল লিনিয়াস ল্যাপোরিডা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লেপুস গণের খরগোশদের চিহ্নিত করেন। বর্তমানে গোটা বিশ্বে ল্যাপোরিডা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত 40 টি আলাদা প্রজাতির খরগোশ রয়েছে; তার মধ্যে শুধুমাত্র লেপুস গণের অন্তর্ভুক্ত 33 টি প্রজাতি এবং ক্যাপ্রোলেগুস ও প্রোমোলেগুস গণের অন্তর্ভুক্ত 7 টি প্রজাতির দেখা মেলে। এদের মধ্যে "*লেপুস ক্যাস্ট্রোভেইজোই*" অন্যতম। এই প্রজাতির তাপগ্রহণযোগ্যতা ও সম্পূর্ণ ইংরেজি "ভি" অক্ষরের মতো দেখতে সম্মুখ মস্তিষ্ক সহ দ্বিপাক্ষিক প্রতিসম দেহ এদেরকে সবার চেয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। ল্যাপোরিডা পরিবারের মধ্যে আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট খরগোশদের 'বানি' বা 'রাবিট' বলা হয়ে থাকে এবং বড় আকারের গুলোকে 'হেয়ার' বা খরগোশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই পৃথিবীতে প্রায় 70টি দেশে মোট 305 টি প্রজাতির গার্হস্থ্য রাবিট দেখা যায়।

তৃণভোজী এই সরল স্বভাবের প্রাণীটি সাধারণত একাকী কিংবা কখনও কখনও জোড়ে বসবাস করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওদের সমূহ বিপদ, চাষবাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নগরায়ন ও সৌন্দর্যায়নের খাতিরে মানুষ তৃণভূমি, গুল্ম অঞ্চল ও ছোট ছোট ঘন সবুজ নরম গাছের অরণ্য নির্দয়ভাবে ধ্বংস করছে; এর ফলে এদের প্রাকৃতিক বাসস্থানের ক্ষতিসাধন হচ্ছে। তার উপর নানা রকম

জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ তো রয়েছেই। চোরাকারবারীরা ওদের সুমিষ্ট মাংস যার মধ্যে খুব উঁচু দরের প্রোটিন পাওয়া যায়, তার জন্য স্বার্থান্ধ হয়ে এই অবলা প্রাণীদের শিকার করে। অনেক সময় আবার শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, নকুল ও বাজপাখি ব্যবহার করে; এছাড়াও শিকারীরা ফাঁদ ও বন্দুকের সাহায্যেও এদের শিকার করে। এর ফলস্বরূপ ওদের অস্তিত্ব আজ সংকটে।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের (আই.ইউ.সি.এন.) লাল তথ্য পুস্তিকার তালিকায় এই "ব্রুম হেয়ার" প্রজাতির খরগোশেরা 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত। দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয়ের পাদদেশে পরিলক্ষিত "হিসপিড হেয়ার"(ক্যাপ্রোলেগুস হিসপিডাস) সেই 1986 সাল থেকেই লাল তথ্য পুস্তিকায় 'বিপদাপন্ন' হিসেবে রেখাঙ্কিত। ভারতবর্ষে লেপুস গণের অন্তর্ভুক্ত 7 টি উপ-প্রজাতির খরগোশ দেখা যায়, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো "*লেপুস নিগ্রিকলিস*", 1823 সালে ফরাসি প্রাণীবিদ জর্জস্ ফ্রেডেরিক ক্যুভিয়ার এই প্রজাতিটিকে আবিষ্কার করেন। আই.ইউ.সি.এন.-এর লাল তথ্য পুস্তিকায় এটি 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে পরিগণিত।

একটি খরগোশের দৈর্ঘ্য স্কেল দিয়েই মাপা যায়, ওজন তাও তিন কেজির মধ্যে, আয়ু খুব বেশি হলে বছর তিনেক, ছোট প্রাণী। তাই আমরা সেই অর্থে কোন গুরুত্বই দিই না। তবুও ওই খরগোশ না থাকলে বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত অনেকগুলো স্থলজ ও জলজ খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়বে। পরিবেশের সকল উপাদানের মধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছাবে না। সামগ্রিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। তাই হোক না জীবনসীমা ছোট, তবুও জীবনের দাম পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীদের সমান ও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে এদের রক্ষা ও এদের প্রাকৃতিক বাসস্থানের ক্ষতিসাধন যেন না হয় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

পিঁপড়ের বল

পিঁপড়ের বুদ্ধির কথা তো আমরা অনেক শুনেছি, আবার দেখেছিও, সেই ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্যের হাত ধরে। এবার আমরা শুনব পিঁপড়ের বলের কথা। আমরা কি একথা জানি যে, পিঁপড়ে অতিক্ষুদ্র একটি জীব হলেও বড় বড় জন্তু-জানোয়ার ও এমনকি মানুষের তুলনায়ও অনেক বেশি শক্তিশালী। একটি ছোট্ট পিঁপড়ে তার দেহের চেয়ে প্রায় বিশ-ত্রিশ গুণ বেশি ওজন ওঠাতে পারে।

অ্যানিমালিয়া রাজ্যের, ইনসেক্টা শ্রেণীর, হাইমেনোপটেরা ক্রমের, ফর্মিসিডা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত পিঁপড়েরা সাধারণত সমাজবদ্ধ হয়ে প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করে। এদের শারীরিক দৈর্ঘ্য সচরাচর 0.75–52 মিলিমিটারের মধ্যে হয়ে থাকে, তবে জীবাশ্ম মধ্যস্থিত "*টিটানোমাইরমা জাইগানটিয়াম*" নামক রাণী পিঁপড়ে পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম পিঁপড়ের প্রজাতি যাদের দৈর্ঘ্য প্রায় 6 সেন্টিমিটার ও ডানার দৈর্ঘ্য প্রায় 15 সেন্টিমিটারের বেশি হয়।

সাধারণত পিঁপড়েরা ছোট আকারের হলেও এদের দেহের দৈর্ঘ্য ও দৈহিক শক্তির অনুপাত অন্যান্য জীবদের চেয়ে আলাদা এবং এই অনুপাতই পিঁপড়েকে শক্তিশালী বানিয়েছে। একটি ছোট্ট পিঁপড়ে তার দৈহিক ওজনের প্রায় 10–50 গুণ ভারী

জিনিসপত্র ওঠাতে সক্ষম। তার উপর আমেরিকা মহাদেশের মেঠো পিঁপড়ে আবার তাদের দেহের ওজনের পাঁচ হাজার গুণ বেশি ওজন ওঠাতে সক্ষম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিভাবে সম্ভব এই অদ্ভুত ক্ষমতার প্রদর্শন?—এর কারণ হলো ওদের শরীরের মধ্যে উপস্থিত একপ্রকার অতি শক্তিশালী মাংসপেশী। সাধারণত ওদের দেহের তিনটি অংশঃ মাথা, বক্ষদেশ ও পেট। অনেক বছর আগে পিঁপড়ের শরীরে ডানা থাকত, কিন্তু অব্যবহারের দরুন বিবর্তনের ধারায় ওই ডানা গুলো আজ আর নেই, তবে ওই জায়গায় একধরনের শক্তিশালী মাংসপেশী জন্মেছে বক্ষদেশে। এই প্রকার মাংসপেশীই ওদের কে অতটা পরিমাণে ওজন তুলতে সাহায্য করে।

এই ধরনের পেশীর কথা প্রথম দাবী করেন ফরাসি দেশের ‘ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এজেন্সি’-তে গবেষণারত পিঁপড়ে-জৈববিজ্ঞানী ড. ক্রিশ্চিয়ান পিটার্স তাঁর প্রথম গবেষণা প্রকল্পে। তিনি পিঁপড়ের শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উন্নততর রঞ্জনরশ্মি-চিত্র-প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই পেশীর সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি মারা যান। পরবর্তীতে জাপানের ‘ওকিনাওয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটি ‘ নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ড. ইভান ইকোনমো প্যারিসের সর্বণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় এই গবেষণা সম্পূর্ণ করেন।

পিঁপড়ে শুধুমাত্র অতিরিক্ত শক্তিশালী তাই নয়, গবেষণায় জানা গেছে পিঁপড়েরা বুদ্ধিদীপ্ত, অন্যান্য জীবের মতো শ্রমজীবী, নিজেদের মধ্যে ও বাস্তুতন্ত্রের বাকি সদস্যদের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম। এছাড়াও এরা মানুষের মতোই তাদের

জীবনের যেকোনো জটিল সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ।

গোটা পৃথিবীতে হাতে গোনা কয়েকটি জায়গা বাদে যেমন আন্টার্কটিকা, গ্রীণল্যান্ড, আইসল্যান্ড, পলিনেশিয়ার একাংশ ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একাংশ বাদে বাকি সর্বত্রই পিঁপড়ের দেখা মেলে। সারা বিশ্বে আনুমানিক বাইশ হাজার প্রজাতির মধ্যে প্রায় ১৩৮০০ প্রজাতি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। পিঁপড়েরা আজ থেকে প্রায় ১৪৫ মিলিয়ন বছর আগে “ভেসপয়েড” নামক বোলতার প্রজাতি থেকে উদ্ভূত। সাধারণত এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম ফর্মিসিডা। ভারতবর্ষে মোট 100 টি গণের 828 টি প্রজাতির পিঁপড়ের দেখা মেলে; যেখানে গোটা এশিয়া মহাদেশে প্রায় 2080 টি প্রজাতির পিঁপড় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে দেখা পাওয়া পিঁপড়ের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রজাতির বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো ল্যাসিয়াস নাইগার, মনোমরিয়াম ফ্যারাওনিস, প্যারাট্রেকিনা লঙ্গিকর্নিস, ক্যাম্পনোটাস পেন্সিলভ্যানিকাস, ট্যাপিনোমা সেসিল, সেলেনপসিস জারমিনাটা,ক্যায়ারবারা ডাইভার্সা ইত্যাদি।

তবে পিঁপড়ে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান ও বলবানই নয়, বাস্তুতন্ত্রের এই ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ জীবটি বিভিন্ন উপকারী কাজে ব্যবহৃত হয়। পিঁপড়ে মাটির মধ্যেকার বায়ু চলাচলের উপযোগী, জৈবিক কীট নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক সাহায্য করে। এছাড়াও কখনো ধর্মীয় প্রথায়, তো কখনো রান্না ঘরে, তো আবার কখনো চিকিৎসা কেন্দ্রে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সৈনিক পিঁপড়ে অস্ত্রপাচারের সময় সেলাই করতে সাহায্য করে। একধরনের বুনন পিঁপড়ে লেবু চাষের সহায়ক, তো আর একদল দক্ষিণ আফ্রিকার “রাইবো” নামে ভেষজ চায়ের উৎপাদনে ফলপ্রসূ। মেক্সিকোর পিঁপড়ের ডিমের পদ, থাইল্যান্ডের পিঁপড়ের লার্ভার পদ এবং কলম্বিয়ার ঝলসানো পিঁপড়ের পদ সত্যিই আমাদের জিভে জল এনে দেয়। ●

*লেখক **শ্রী তুহিন সাজ্জাদ সেখ** বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞান কর্মী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: sk.sajjadtuhin14@gmail.com*

জলের প্রয়োজনীয়তা, দূষণ, ব্যবহার ও অপচয় সম্পর্কে গণসচেতনতা জরুরি

নন্দগোপাল পাত্র

‘মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্র-পথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়।’

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীতি আয়োগের ‘কম্পোজিট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স’-এর পূর্বাভাস, অভূতপূর্ব জলসঙ্কটে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন 6% কমে যেতে পারে। ‘ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট’ ব্যর্থ জলসম্পদ ব্যবহারের সঠিক দিশা বাতলাতে। 1982তে তৈরি ‘ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি’র (NWDA) ভূমিকাও অস্পষ্ট। প্রথম বিশ্বে জল ব্যবহারে নয়া স্লোগান: ‘রিডিউস, রিসাইকেল অ্যান্ড রিইউজ’। ‘লো কার্বন ইকনমি’র মত নয়া ভারতেরও স্বপ্ন হওয়া উচিত ‘লো ওয়াটার ইকনমি’। এরকম যখন পরিস্থিতি তখন মাঝেমধ্যে সংবাদপত্রের পাতায় দেখতে পাওয়া যায় এক বছরে এক/দু’ই কোটি গ্রামীণ গৃহ পানীয় জলের পাইপের সঙ্গে যুক্ত হবে। অধিকাংশ গ্রামীণ গৃহস্থালিতে পাইপ-সংযুক্ত করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ জলের ব্যবস্থা করা।

2021-এ টক্সিক কেমিক্যাল “*ননাইলফেনল (nonylphenol) অ্যা ব্যারিয়ার টু সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার*” সূত্রে জানা গেল ননাইলফেনল জাতীয় মারাত্মক রাসায়নিক ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশে কোনও নিয়মনীতি নেই যা ধীরে ধীরে আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থায় প্রবেশ করছে। ননাইলফেনল ইথোক্সিলেট (nonylphenol ethoxylate) উৎপাদনে ননাইলফেনল ব্যবহার হয়। আবার ননাইলফেনল ইথোক্সিলেট ব্যবহার হয় সার্ফ্যাক্ট্যান্টস (surfactants), ডিটারজেন্টস (detergents), ডিফোমারস (defoamers), অ্যান্টিস্ট্যাটিক এজেন্টস (antistatic agents), ডিসপারসেন্টস (dispersants), ল্যাটেক্স রং, আঠা, কীটনাশক প্রভৃতি পণ্যের শিল্পোৎপাদনে। পরিবেশে ননাইলফেনল এবং ননাইলফেনল ইথোক্সিলেটস আসে প্রধানত ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ল্যান্ডফিল এবং নর্দমার স্লাজ থেকে। প্লাস্টিকের বোতল থেকেও ননাইলফেনল নিঃসৃত হয়ে জলে মেশে। ভারতীয় গবেষণা সংস্থা টক্সিক লিঙ্ক-এর 2021-এ প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ননাইলফেনল ইথোক্সিলেটস প্রাকৃতিক পরিবেশে ননাইলফেনল-এ ভেঙ্গে যায় এবং বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করে। এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে মানব শরীরের দুধ, রক্ত, মুত্রসহ জলজ প্রাণীদের শরীরে।

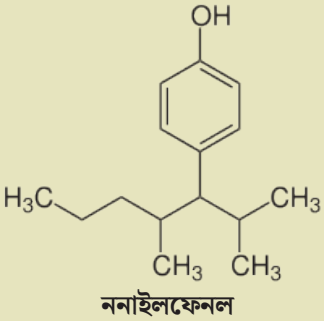

ননাইলফেনল

বার্তোনি-র (Bartoni) শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে, প্রতি লিটারে ননাইলফেনল 1, 1–10 এবং 10 মাইক্রোগ্রাম যথাক্রমে কম দূষিত, দূষিত, বেশিমাত্রায় দূষিত হিসাবে বিবেচিত হত। 2019-এ টক্সিক লিঙ্ক ডার্টি ট্রেল: ডিটারজেন্ট টু ওয়াটার বডিজ সমীক্ষায় দেখেছে আমাদের দেশে বিভিন্ন নদীর জলে ননাইলফেনল-এর উপস্থিতি 9.2–41.3 মিলিগ্রাম। 2021-এর সমীক্ষায় টক্সিক লিঙ্ক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পনেরোটি পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য নয়াদিল্লির শ্রীরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চে পাঠিয়েছিল। পঞ্জাবের ভাতিন্দায় নলকূপের জলে 80.5 এবং নয়া দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থে 29.1 মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটারে পাওয়া গেছে। যা রীতিমতো উদ্বেগের বিষয়।

ইতিমধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ননাইলফেনল, ননাইলফেনল ইথোক্সিলেটস-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। পরিবর্তে অ্যালকোহল ইথোক্সিলেটস ব্যবহার হচ্ছে।

অন্যদিকে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) পানীয় জলে ফেনলিক যৌগগুলি পরিমাণ প্রতি লিটারে 0.001 মিলিগ্রাম এবং ভৌম জলে প্রতি লিটারে 5 মিলিগ্রাম মান

৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য...

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

আইরিন জুলিয়ট কুরি

বিখ্যাত বিজ্ঞানী দম্পতি পিয়েরে কুরি এবং মেরি কুরির বড় মেয়ে আইরিন কুরি জন্মগ্রহণ করেন 1897 সালের 12 সেপ্টেম্বর। তিনি ছিলেন একজন ফরাসি রসায়নবিদ, পদার্থবিদ এবং রাজনীতিবিদ, এবং বিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক জুলিয়ট কুরির স্ত্রী। 1928 সাল থেকে আইরিন কুরি এবং তার স্বামী ফ্রেডেরিক পারমাণবিক নিউক্লিয়াস অধ্যয়নের উপর তাদের গবেষণা শুরু করেন। পজিট্রন সনাক্তকরণের জন্য তারা গামা রশ্মি ব্যবহার করেন। 1933 সালে, আইরিন এবং তার স্বামী প্রথম নিউট্রনের সঠিক ভর নির্ণয় করেন। অ্যালুমিনিয়ামের ওপর আলফা রশ্মি প্রয়োগ করার সময় তারা আবিষ্কার করেছিল যে শুধুমাত্র প্রোটন সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নির্ণয়যোগ্য ইলেক্ট্রন এবং পজিট্রন জোড়ার উপর ভিত্তি করে তারা প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রোটনগুলি নিউট্রন এবং পজিট্রনে পরিবর্তিত হয়।1934 সালে তারা বোরন থেকে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন, অ্যালুমিনিয়াম থেকে ফসফরাসের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এবং সিলিকন থেকে ম্যাগনেসিয়াম তৈরি করতে সক্ষম হন। অ্যালুমিনিয়ামের প্রাকৃতিক স্থিতিশীল আইসোটোপকে আলফা কণা (অর্থাৎ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস) দিয়ে আঘাত করার ফলে ফসফরাসের একটি অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হয়। এই আবিষ্কারটি আনুষ্ঠানিকভাবে পজিট্রন নির্গমন বা বিটা ক্ষয় নামে পরিচিত, যেখানে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের একটি প্রোটন একটি নিউট্রনে পরিবর্তিত হয় এবং একটি পজিট্রন ও একটি ইলেক্ট্রন নিউট্রিনো নির্গত হয়। এর মধ্যে দিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োগ বাড়তে থাকে এবং এই আবিষ্কারের ফলে রোগ নিরাময়যোগ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্রুত, সস্তায় এবং প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা সম্ভব হয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য 1935 সালে আইরিন এবং তার স্বামীর সাথে যৌথভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 1956 সালে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত আইরিন কুরিকে প্যারিসের কুরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে 17 মার্চ 58 বছর বয়সে তিনি মারা যান। সম্ভবত এই মারণরোগ হয়েছিল পোলোনিয়াম-210 থেকে বিকিরণের কারণে।

ওলে রোমার

ডেনমার্কের যে বিজ্ঞানীদের নাম আমরা প্রায় সকলেই জানি তাদের মধ্যে সম্ভবত সব থেকে প্রবীণ ওলে রোমার। নিউটনের একেবারে সমসাময়িক রোমারের জন্ম নিউটনের জন্মের দু বছর পরে 1644 সালে, সেপ্টেম্বর মাসের 19 তারিখে। আলোর গতিবেগ অসীম কিনা তা নিয়ে অগ্রজ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পরীক্ষা করেছিলেন। সেখান থেকে পাওয়া যায় নি কোন সুনির্দিষ্ট দিশা। রোমার ধরে নিলেন যে আলোর গতিবেগ খুব বেশি হলেও তা অসীম নয় এবং সেই উচ্চ গতিবেগ পরিমাপের জন্য তিনি সাহায্য নিলেন একটি প্রাকৃতিক ঘটনার। বৃহস্পতির বড় উপগ্রহগুলির অন্যতম ইও'র গ্রহণ থেকে তিনি পৃথিবীতে বসে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আলোর যে গতিবেগ নির্ণয় করলেন তা এখনকার মানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ছিল। আলোর গতিবেগের এই মান প্রকৃত মানের থেকে কিছুটা কম হলেও এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে আলোর গতিবেগ অসীম নয়। রোমারের আরেকটি কাজের সঙ্গে তাপমাত্রার পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত থার্মোমিটারের বিশেষ যোগ রয়েছে। বস্তুত রোমার একটি তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল উদ্ভাবনা করেন জার্মান যন্ত্রবিদ জন গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইটের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে। রোমার স্কেল নামে পরিচিত এই স্কেলে বরফ বিন্দু ছিল 7.5 ডিগ্রী (রোমার) আর জলে ফুটে বাষ্পীভূত হত 60 ডিগ্রী (রোমার) তাপমাত্রায়। 1701 সালে উপস্থাপিত এই তাপমাত্রা মাপার স্কেলটি ছিল প্রথম অংশাঙ্কিত তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল। তার আগে নিউটন তাপমাত্রা পরিমাপের একটি স্কেল দিলেও সেখানে অংশাঙ্কন ছিল না আর ব্যবহার করা হয়নি তাপমাত্রা শব্দটিও। রোমারের মৃত্যুও হয় সেপ্টেম্বর মাসে। 1710 সালের 16 ই সেপ্টেম্বর তিনি কোপেনহাগেনে প্রয়াত হন।

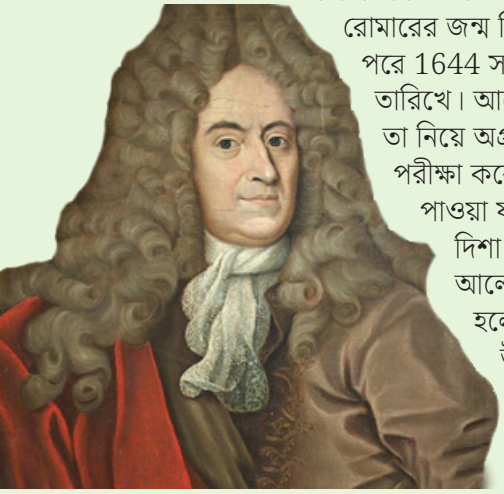

সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর

1910 সালের 19 অক্টোবর অবিভক্ত ভারতের লাহোরে তার পিতার কর্মক্ষেত্রে সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে নোবেলজয়ী স্যার সি ভি রামন ছিলেন তার কাকা। পদার্থবিদ্যার উজ্জ্বল ছাত্র চন্দ্রশেখর অবশ্য তার উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের সবটুকুই প্রথমে ইংল্যান্ড ও পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিবাহিত করেন। বস্তুত 1983 সালে চন্দ্রশেখর পদার্থবিদ্যার নোবেলের অংশীদার হন আর এক মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম এ ফাউলারের সঙ্গে। জ্যোর্তিবিজ্ঞানের চন্দ্রশেখর লিমিট বা চন্দ্রশেখর সীমা বেশ পরিচিত নাম। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে একজন ছাত্র হিসেবে সুব্রামানিয়াম চন্দ্রশেখরের করা বিশেষ গণনার মধ্যে দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল ওই সীমার। আমরা এখন জানি যে চন্দ্রশেখর সীমা বলতে বোঝায় নক্ষত্রদের এক সীমাবদ্ধতার কথা, যেখানে একটি সাদা বামন নক্ষত্রের সর্বোচ্চ ভর সূর্যের ভরের তুলনায় 1.44 গুণ পর্যন্ত ভারী হতে পারে। জ্যোর্তিবিদ্যায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত। চন্দ্রশেখরের নামে নাসা তৈরি করেছে ‘চন্দ্রা এক্স-রে অবসার্ভেটারি’ আর একটি গ্রহাণু পরিচিত হয়েছে ‘1958 চন্দ্রা’ হিসেবে। ●

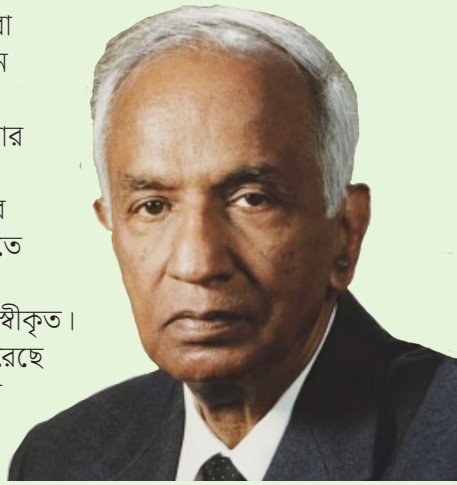

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে যে পারমাণবিক গবেষণার কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয় সেই কাজে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। 1909 সালের অক্টোবর মাসের 30 তারিখে ভাবা মুম্বাই তে (তৎকালীন বোম্বাই) সম্পন্ন পার্শী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ভাবা ইংল্যান্ডে প্রথমে তার বাবার ইচ্ছানুযায়ী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তার গভীর টানের জন্য বাবার অনুমতি নিয়ে সেই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরে তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং নোবেলজয়ী স্যার সি ভি রামন তখন ছিলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান। 1945 সালে মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয় টাটা ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং ভাবা সেখানে অধ্যাপনা ও গবেষণা শুরু করেন। 1947 এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু তাকে ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু করা দায়িত্ব দেন। এই কাজটি ভাবা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে পরিচালনা করেন এবং সদ্য স্বাধীন একটি দেশে এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মানব-সম্পদ গড়ে তোলার বিশেষ উদ্যোগ নেন। ভাবার জীবন ছিল বিজ্ঞান ও কলার প্রকৃষ্ট মেলবন্ধন। চিত্রকর ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তিনি পরিচিত মহলে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। 1966 সালে একটি বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়, যাকে ঘিরে কিছু বিতর্ক রয়ে গেছে। তার মৃত্যুর পরে মুম্বাইতে অবস্থিত আমাদের দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রতিষ্ঠানটি তার স্মৃতিতে নামকরণ করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর ভারতকে পারমাণবিক গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে এক আধুনিক রাষ্ট্রে উন্নীত করার ব্যাপার হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ●

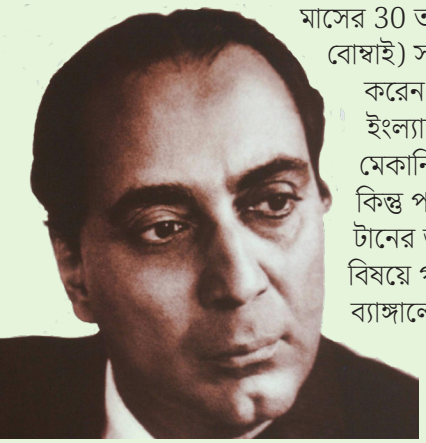

... ৫১ পৃষ্ঠার পর

নির্ধারণ করেছে [*আইএস 3025 (পার্ট 43): 1992 (রিফার্মড 2003)*]। পানীয় জল এবং ভৌম জলে ননাইলফেনল বা ননাইলফেনল ইথোক্সিলেটসগুলির কোনও নির্দিষ্ট মান ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস-এর তখনও ছিল না! জানা গেছে ভারতে পানীয় জলের ননাইলফেনল এবং ননাইলফেনল ইথোক্সিলেটের ঘনত্বের উপর নজরদারি করার কোনও এখনও গড়ে উঠেনি। প্রস্টেট ও স্তন ক্যানসারসহ একাধিক রোগ সৃষ্টিকারী ননাইলফেনল এবং ননাইলফেনল ইথোক্সিলেটসের পরিমাণ পানীয় জলে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

জলবায়ু বদলের পিছনে যেমন অরণ্যনিধন ও কার্বন নির্গমন দায়ী, তেমনই জলের দূষণের জন্যও দায়ী মানুষই। কারণ, নির্বিচারে যে-হারে মাটি থেকে জল তোলা হচ্ছে তাতে ভূগর্ভের জলের সঙ্কট বাড়ছে। এরকম যখন পরিস্থিতি তখন ভূ-গর্ভের জলের পরিবর্তে আমাদের নির্ভরতা বাড়াতে হবে ভূ-তলের জলের উপর। এছাড়া সাধারণ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় জলদূষণ নিয়ে সচেতনতার দায় সারি। তা-ই সব কিছুর আগে জরুরি জলের প্রয়োজনীয়তা বোঝা, জলের দূষণ, ব্যবহার ও অপচয় সম্পর্কে গণসচেতনতা। ●

*লেখক **শ্রী নন্দগোপাল পাত্র** শিক্ষক, লোকবিজ্ঞান কর্মী ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: ngpatra@gmail.com*

অক্টোবরের আবিষ্কার

জেরোগ্রাফী বা আজকের জেরক্স

1938 সালের অক্টোবর মাসে অবশেষে সফল হলেন চেস্টার ফ্লয়েড কার্লসন (1906-1968)। মার্কিন এই নাগরিক একাধারে বিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ এবং আজকের ভাষায় ছিলেন উদ্যোগপতি। 1920 এর দশকে তিনি বেল ল্যাবরেটরির পেটেন্ট বিভাগে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন তাকে বহু নথি নকল বা কপি করতে হচ্ছে। আর সেই 1920 এর দশকে, আজ থেকে প্রায় এক'শ বছর আগে সেই সময়কার প্রযুক্তিতে এই কাজটা ছিল বেশ কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ও বিরক্তিকর। বলা দরকার সেই প্রযুক্তি বলতে ছিল কার্বন পেপার দিয়ে হাতে লেখা নকল করা কিংবা মাইমোগ্রাফ অথবা ফটোকপি করা আর শেষের দুটি ছিল কার্বন পেপার দিয়ে কপি করার তুলনায় অনেক বেশে ব্যয়সাপেক্ষ। কার্লসনের মুদ্রণ-প্রযুক্তিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল কিন্তু ত্রিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মন্দায় তিনি তার চাকরি হারান এবং বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়েন। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে

তিনি এই উদ্দেশ্যে আবার কাজ শুরু করেন এবং এই কাজে তিনি সঙ্গে পায়ে যান এক তরুণ অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ অটো কোর্নেই কে। তিনিও তখন কাজের সন্ধান করছিলেন।

অনেক পরিশ্রমে তাদের কাজে প্রাথমিক সাফল্য আসে। তারা চাইছিলেন কোন রাসায়নিক ব্যবহার না করে ফটোকন্ডাক্টিভিটির বা আলোর সাহায্যে তড়িৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধির নীতি কাজে লাগিয়ে একেবারে শুষ্ক উপায়ে এই কপির কাজ করতে। এই পদ্ধতিতে প্রথম ফটো বা কপি সম্ভব হয় 1938 সালের 22শে অক্টোবর। এখানে সেই বিখ্যাত কপিটির একটি নমুনা রাখা হলো। তারপর কার্লসন পুরো পদ্ধতিটির অনেক উন্নতিসাধন করেন এবং আমাদের হাতে অতি স্বল্পমূল্যে কপি করার এমন একটি উপায় তুলে দেন যা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে। ●

51 পেগাসি বি (51 Pegasi b)

মানুষের মনে যে সব প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে তার অন্যতম হচ্ছে এই মহাবিশ্বে আমরা কি নিতান্তই একা। অর্থাৎ আমাদের এই জীব-সম্পদে পূর্ণ পৃথিবীর মত আর কোন জায়গা কি আছে? সৌরজগতে যে তা নেই তা আমরা বুঝতে পেরেছি মেনে নিয়েছি। কিন্তু তার বাইরে? না সেই জবাবও এখনও মেলে নি কিন্তু তার দিকে একধাপ এগোনো সম্ভব হয়েছে 1995 সালের অক্টোবর মাসে। সেই মাসের 6 তারিখে সন্ধান মিলেছে মহাকাশের এমন এক সদস্যের যে আমাদের সূর্য নয় অন্য এক নক্ষত্রকে ঘিরে পাক খাচ্ছে অর্থাৎ সেটিও এক গ্রহ, তবে আমাদের সৌরজগতের নয়। পেগাসাস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মোটামুটি 15 আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে ওই নক্ষত্র আর সেই নক্ষত্রকে ঘিরে পাক খাওয়া ওই গ্রহকে ইংরাজিতে বলা হয়েছে exoplanet যার বাংলা হিসেবে বলা যায় বহিঃসৌরগ্রহ। তবে আমাদের এত কষ্ট করে বলতে হবে না কারণ এই গ্রহের একটি নাম দেওয়া হয়েছে। প্রথম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক রীতি মেনে ইন্টারন্যাশানাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ান তার নাম দিয়েছে 51 Pegasi b। এই নাম জ্যোতির্বিদের ব্যবহার করবেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নামও দেওয়া হয়েছে আমাদের ব্যবহারের জন্য। দেখা যাচ্ছে এই নামটি আমাদের কয়েকটি চেনা বাংলা শব্দের বড্ড কাছাকাছি। এই বহিঃসৌরগ্রহের নাম হচ্ছে ডিমিডিয়াম (Dimidium) উচ্চারণ করলেই বাংলা কয়েকটি শব্দের কথা মাথায় চলে আসবে। 2019 সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার তিনজন বিজ্ঞানী, জেমস পীবলস, মাইকেল মেয়র এবং ডিডিয়ার কুইলজের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। নোবেল ঘোষণাপত্র থেকে আমরা জানতে পারি এই বিজ্ঞানীদের প্রথমজন পুরস্কার পাচ্ছেন "ভৌত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে তাত্ত্বিক আবিষ্কারের জন্য" আর অন্য দুই বিজ্ঞানী এই স্বীকৃতি পাচ্ছেন "সূর্যের মত আর এক নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত এক বহিঃসৌরগ্রহের আবিষ্কারের জন্য"। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কত বড় এই আবিষ্কার। এই পথেই হয়ত বা কোনদিন আর এক পৃথিবী-সুলভ কোন গ্রহের সন্ধান মিলবে। আমাদের বসুন্ধরা সন্ধান পেয়ে যাবে তার যমজ বোনের। ●

দ্বিমুখী টেলিফোন কথোপকথন

19 শতকে টেলিগ্রাফ ছিল দূর-দূরত্বের যোগাযোগের প্রধান রূপ। এই ব্যবস্থায় সাফল্যের সাথে সাথে অনেক সীমাবদ্ধতাও ছিল। এই ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এক সময়ে একাধিক টেলিগ্রাফের ট্রান্সমিশনের প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং 1876 সাল নাগাদ বেল তার সহকারী টমাস এ. ওয়াটসনের সহায়তায় "বিদ্যুতের মাধ্যমে কথা বলার" উপায় হিসাবে টেলিফোন তৈরি করেছিলেন। 1876 সালের মার্চ মাসে বেল ওয়াটসনের সাথে তার টেলিফোন প্রোটোটাইপের মাধ্যমে প্রথম কথা বলেন। কিন্তু 9ই অক্টোবর ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন যখন যখন বেল এবং ওয়াটসন বোস্টন ও পূর্ব কেমব্রিজের মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইনের মাধ্যমে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই ঘটনাটি দূরসঞ্চারের ইতিহাসে টেলিগ্রাফের যুগের সমাপ্তি এবং টেলিফোনের যুগের সূচনাকে সূচিত করে।

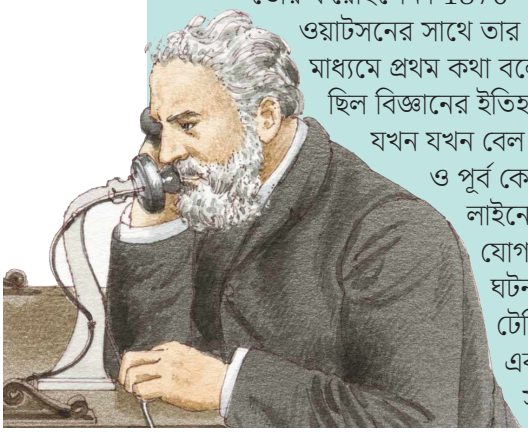

প্রথম অভ্যন্তরীণ পেসমেকার

1950 এর দশকেই হৃদপিণ্ডের ছন্দকে উদ্দীপিতকারী বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিকিৎসকদের কাছে স্পষ্ট ছিল। প্রথম ব্যাটারি চালিত পেসমেকার তৈরি করা হয়েছিল 1957 সালে। সেই সময় পেসমেকারগুলিকে বাহ্যিক আউটলেটে যুক্ত করতে হত, যা ওই যন্ত্র ব্যবহারকারী রোগীদের জন্য অসুবিধাজনক ছিল। 1958 সালে, ডাঃ রুন এলমকভিস্ট প্রথম শরীরের অভ্যন্তরে সংস্থাপনযোগ্য পেসমেকার তৈরি করেন। সেই বছর 8ই অক্টোবর ডাঃ আকে সেনিং কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ায় ভুগছেন এমন একজন সুইডিশ নাগরিক আর্নে লারসনের দেহে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রথম অভ্যন্তরীণ সংস্থাপনযোগ্য পেসমেকার স্থাপন করেন। যদিও এই বিশেষ মডেলটি মাত্র 3 ঘন্টার জন্য কাজ করেছিল তবুও এই পদক্ষেপটি ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মাইলফলক এবং আধুনিক পেসমেকারের বিবর্তনের প্রথম ধাপ।

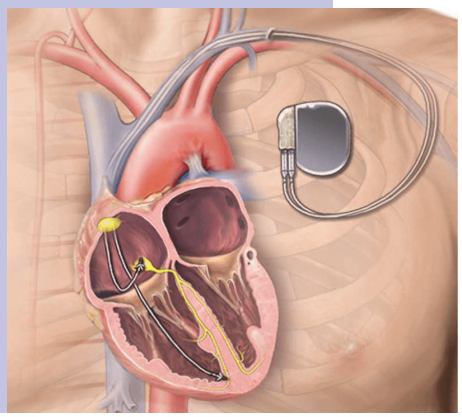

সাবিন পোলিও ভ্যাকসিন

পোলিওভাইরাস হল পক্ষাঘাতজনিত রোগ পোলিওমাইলাইটিসের জন্য দায়ী একটি ভাইরাস এবং এটি বিংশ শতকের সবচেয়ে বিধ্বংসী মহামারীগুলির মধ্যে একটি। যদিও বেশিরভাগ পোলিওমাইলাইটিস রোগীদের রোগের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তবে আক্রান্ত ব্যক্তিরা আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে থাকে, ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ডাঃ জোনাস সালক প্রথম একটি ইনজেকশনযোগ্য ভ্যাকসিন তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ডাঃ আলবার্ট সাবিন সরাসরি খাইয়ে দেওয়ার উপযুক্ত পোলিও ভ্যাকসিন তৈরী করেন। 1956 সালের 6ই অক্টোবর ডাঃ সাবিন ঘোষণা করেন যে তার পোলিও ভ্যাকসিন গণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। সাবিন ভ্যাকসিন যেমন ইনজেকশানের মাধ্যমে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না তেমনই সেখানে সালক ভ্যাকসিনের মতো বুস্টারের প্রয়োজন ছিল না। সাবিন ভ্যাকসিন বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উভয় টিকাই বেশিরভাগ দেশ থেকে পোলিওভাইরাস নির্মূলকরণ এবং লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচানোর জন্য কৃতিত্বের দাবী রাখে।

"মৌল-118" সৃষ্টি

আনইউনঅক্টিয়াম যা বিজ্ঞানের জগতে "মৌল-118" নামেও পরিচিত, মানবসৃষ্ট সবচেয়ে ভারী মৌল এবং 118টি প্রোটন এবং 176টি নিউট্রন নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ, এই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 118 ও ভর সংখ্যা 294। এই উপাদানটি রাশিয়ার দুবনায় একটি কণা ত্বরণকারী যন্ত্রে তৈরি করা হয়েছিল যার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র এক মিলিসেকেন্ডের। রাশিয়ার জয়েন্ট ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার রিসার্চ এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির গবেষকদের সাথে যৌথ সহযোগিতায় 2006 সালের 16ই অক্টোবর এই মৌল সৃষ্টির ঘোষণাটি করা হয়। লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির গবেষকরা 1999 সালে "মৌল-118" তৈরির ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তথ্যগত অনিশ্চয়তার কারণে তারা তাদের ফলাফল প্রত্যাহার করে নেন। "মৌল-118" আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে ভারী মৌল হিসাবে পরিচিত এবং এটি রাসায়নিক উপাদান তৈরি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

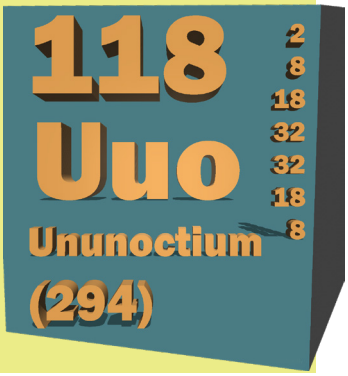

গ্রন্থ সমালোচনা

গণিতের দুনিয়ায় কিছুক্ষণ

ড. বিকাশ চক্রবর্তী রচিত “গণিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ” বইটির বিষয়ের পরিচয় তার নামেই নিহিত রয়েছে। বইটিতে কি রয়েছে তা লেখক প্রাক কথন এ বলেছেন “.... এই বই কোনো মৌলিক লেখা নয়। বরং বলা ভালো, এই বই, গণিতের বহুল চর্চিত কিছু প্রাথমিক ধারণা এবং ধাঁধাঁ (paradox!) গল্পচ্ছলে বলার প্রয়াস”! আমরা সকলেই জানি যে গণিতের পরতে পরতে রয়ে গেছে নানা আকর্ষণীয় বিষয় যা ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষকের পক্ষে তুলে ধরা সবসময় সম্ভব হয় না। আর সেজন্যই রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজের এক তরুণ শিক্ষক কিছুটা আড়ালে থেকে যাওয়া এই বিষয়গুলির দিকে যে দৃষ্টিপাত করেছেন তা প্রসংশার দাবী রাখে। বইটি বিজ্ঞান প্রসারের SCoPE-বাংলা কর্মসূচি ও রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানান্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে উঠে এসেছে অসীম শ্রেণির সজ্ঞাবিরোধী (counterintuitive) এক বিখ্যাত কূট গণিতের জগতে যার পরিচয় Infinite Hotel paradox হিসেবে এবং যা লেখক উপস্থাপিত করেছেন ‘হিলবার্ট সাহেবের হোটেল” শিরোনামে। মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের এক প্রাচীন পদ্ধতি “এরটোনিস্থিসের ছাঁকনি” সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে, কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। আর এক নিবন্ধে এসেছে বিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ কার্ল ফ্রেডেরিখ গাউসের কথা। একেবারে বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তিনি গণিতে যে বুৎপত্তি দেখিয়েছিলেন তার চমৎকার উল্লেখ রয়েছে একটি নিবন্ধে।

গণিতে সংখ্যারা সর্বদাই আলোচনায় আসে আর তাদের অজস্র অসংখ্য ধর্ম গণিতবিদদের সতত আকর্ষিত করেছে। তার প্রমাণ রয়েছে এই বইতেও। ড চক্রবর্তী ‘সংখ্যার কথা শীর্ষক পাঁচটি ছোট পর্বের এক নিবন্ধে সংখ্যা ও শ্রেণির ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অপেক্ষাকৃত ছোট এই বইটির মধ্যে দিয়ে গণিতের জগতে ছোট্ট একটি পরিভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। বেশ কিছু উপযুক্ত স্কেচ ও ছবি এবং অপেক্ষাকৃত বড় ছাপার হরফ বইটির প্রতি ছাত্রমহলকে আকৃষ্ট করবে বলে মনে হয়। তবে বইতে ব্যবহৃত সংখ্যা আগাগোড়াই রোমান হওয়া উচিত ছিল, এখানে তা

গণিতের দুনিয়ায় কিছুক্ষণ
ড. বিকাশ চক্রবর্তী

ISBN: 978-81-7480-414-3
পৃষ্ঠা: 104 | মূল্য: 150.00

কোথাও রয়েছে বাংলায় কোথাও তা রয়েছে রোমান সংখ্যায়। বইটির পাঠক গোষ্ঠী সম্পর্কে লেখক কি ভেবেছেন ঠিক বোঝা গেল না, কারণ এখানে একেবারে বিদ্যালয়ের উপযোগী রচনার সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হয়েছে বেশ খানিকটা উচ্চতর পর্যায়ের বিষয়। আশা করবো এই তরুণ লেখক অদূর ভবিষ্যতে আমাদের গণিত-বিষয়ক আরও বই উপহার দেবেন।

ডঃ ভুপতি চক্রবর্তী (chakrabhu@gmail.com)

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh@sunpublish.com. প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।